বাদশাহী আংটি

১

বাবা যখন বললেন, 'তোর ধীরুকাকা অনেকদিন থেকে বলছেন—তাই ভাবছি এবার পুজোর ছুটিটা লখ্‌নৌতেই কাটিয়ে আসি'—তখন আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস ছিল লখ্‌নৌটা বেশ বাজে জায়গা। অবিশ্যি বাবা বলেছিলেন ওখান থেকে আমরা হরিদ্বার লছমনঝুলাও ঘুরে আসব, আর লছমনঝুলাতে পাহাড়ও আছে—কিন্তু সে আর কদিনের জন্য? এর আগে প্রত্যেক ছুটিতে দার্জিলিং না হয় পুরী গিয়েছি। আমার পাহাড়ও ভাল লাগে, আবার সমুদ্রও ভাল লাগে। লখ্‌নৌতে দুটোর একটাও নেই। তাই বাবাকে

বললাম, 'ফেলুদা যেতে পারে না আমাদের সঙ্গে ?'

ফেলুদা বলে ও কলকাতা ছেড়ে যেখানেই যাক না কেন, ওকে ঘিরে নাকি রহস্যজনক ঘটনা সব গজিয়ে ওঠে। আর সত্যিই, দার্জিলিং-এ যেবার ও আমাদের সঙ্গে ছিল, ঠিক সেবারই রাজেনবাবুকে জড়িয়ে সেই অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটল। তেমন যদি হয় তা হলে জায়গা ভাল না হলেও খুব ক্ষতি নেই।

বাবা বললেন, 'ফেলু তো আসতেই পারে, কিন্তু ও যে নতুন চাকরি নিয়েছে, ছুটি পাবে কি ?'

ফেলুদাকে লখনৌয়ের কথা বলতেই ও বলল, 'ফিফ্‌টি-এইটে গেস্‌লাম—ক্রিকেট খেলতে। জায়গাটা নেহাত ফেলনা নয়। বড়াইমামবড়ার ভুলভুলাইয়ার ভেতরে যদি ঢুকিস তো তোর চোখ আর মন একসঙ্গে ধাঁধিয়ে যাবে। নবাব-বাদশাহের কী ইম্যাজিনেশন ছিল—বাপ্‌রে বাপ্‌ !'

'তুমি ছুটি পাবে তো ?'

ফেলুদা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল, 'আর শুধু ভুলভুলাইয়া কেন—গুম্‌তী নদীর ওপর মাঙ্কি ব্রিজ দেখবি, সেপাইদের কামানের গোলায় বিধ্বস্ত রেসিডেন্সি দেখবি।'

'রেসিডেন্সি আবার কী ?'

'সেপাই বিদ্রোহের সময় গোরা সৈনিকদের ঘাঁটি ছিল ওটা। কিস্যু করতে পারেনি। ঘেরাও করে গোলা দেগে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল সেপাইরা।'

দুবছর হল চাকরি নিয়েছে ফেলুদা, কিন্তু প্রথম বছর কোনও ছুটি নেয়নি বলে পনেরো দিনের ছুটি পেতে ওর কোনও অসুবিধে হল না।

এখানে বলে রাখি—ফেলুদা আমার মাসতুতো দাদা। আমার বয়স চোদ্দো, আর ওর সাতাশ। ওকে কেউ কেউ বলে আধপাগলা, কেউ কেউ বলে খামখেয়ালি, আবার কেউ কেউ বলে কুঁড়ে। আমি কিন্তু জানি ওই বয়সে ফেলুদার মতো বুদ্ধি খুব কম লোকের হয়। আর ওর মনের মতো কাজ পেলে ওর মতো খাটতে খুব কম লোকে পারে। তা ছাড়া ও ভাল ক্রিকেট জানে, প্রায় একশো রকম ইনডোর গেম বা ঘরে বসে খেলা জানে, তাসের ম্যাজিক জানে, একটু একটু হিপ্‌নটিজম্‌ জানে, ডান হাত আর বাঁ হাত দুহাতেই লিখতে জানে। আর ও যখন স্কুলে পড়ত তখনই ওর মেমারি এত ভাল ছিল যে ও দুবার রিডিং পড়েই পুরো 'দেবতার গ্রাস' মুখস্থ করেছিল।

কিন্তু ফেলুদার যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা, সেটি হল—ও বিলিতি বই পড়ে আর নিজের বুদ্ধিতে দারুণ ডিটেক্‌টিভের কাজ শিখে নিয়েছে। তার মানে অবশ্যি এই নয় যে চোর ডাকাত খুনি এইসব ধরার জন্য পুলিশ ফেলুদাকে ডাকে। ও হল যাকে বলে শখের ডিটেক্‌টিভ।

সেটা বোঝা যায় যখন একজন অচেনা লোককে একবার দেখেই ফেলুদা তার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিতে পারে।

যেমন লখনৌ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে ধীরুকাকাকে দেখেই ও আমায় ফিসফিস করে বলল, 'তোর কাকার বুঝি বাগানের শখ ?'

আমি যদিও জানতাম ধীরুকাকার বাগানের কথা, ফেলুদার কিন্তু মোটেই জানার কথা নয়, কারণ, যদিও ফেলুদা আমার মাসতুতো ভাই, ধীরুকাকা কিন্তু আমার আসল কাকা নন, বাবার ছেলেবেলার বন্ধু।

তাই আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী করে জানলে ?'

ফেলুদা আবার ফিসফিস করে বলল, 'উনি পিছন ফিরলে দেখবি ওঁর ডান পায়ের জুতোর

গোড়ালির পাশ দিয়ে একটা গোলাপ পাতার ডগা বেরিয়ে আছে। আর ডান হাতের তর্জনীটায় দেখ টিনচার আয়োডিন লাগানো। সকালে বাগানে গিয়ে গোলাপ ফুল ছাঁটার ফল।'

স্টেশন থেকে বাড়ি আসার পথে বুঝলাম লখ্নৌ শহরটা আসলে খুব সুন্দর। গম্বুজ আর মিনারওয়ালা বাড়ি দেখা যাচ্ছে চারদিকে, রাস্তাগুলো চওড়া আর পরিষ্কার, আর তাতে মোটরগাড়ি ছাড়াও দুটো নতুন রকমের ঘোড়ার গাড়ি চলতে দেখলাম। তার একটার নাম টাঙ্গা আর অন্যটা এক্কা। 'এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে'—এই জিনিসটা নিজের চোখে এই প্রথম দেখলাম। ধীরুকাকার পুরনো সেভ্রোলে গাড়ি না থাকলে আমাদের হয়তো ওরই একটাতে চড়তে হত।

যেতে যেতে ধীরুকাকা বললেন, 'এখানে না এলে কি বুঝতে পারতে শহরটা এত সুন্দর? আর কলকাতার মতো আবর্জনা কি দেখতে পাচ্ছ রাস্তাঘাটে? আর কত গাছ দেখো, আর কত ফুলের বাগান।'

বাবা আর ধীরুকাকা পিছনে বসেছিলেন, ফেলুদা আর আমি সামনে। আমার পাশেই বসে গাড়ি চালাচ্ছে ধীরুকাকার ড্রাইভার দীনদয়াল সিং। ফেলুদা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'ভুলভুলাইয়ার কথাটা জিজ্ঞেস কর।'

ফেলুদা কিছু করতে বললে সেটা না করে পারি না। তাই বললাম, 'আচ্ছা ধীরুকাকা, ভুলভুলাইয়া কী জিনিস?'

ধীরুকাকা বললেন, 'দেখবে দেখবে—সব দেখবে। ভুলভুলাইয়া হল ইমামবড়ার ভেতরে একটা গোলকধাঁধা। আমরা বাঙালিরা অবিশ্যি বলি ঘুলঘুলিয়া, কিন্তু আসল নাম ওই ভুলভুলাইয়া। নবাবরা তাঁদের বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন ওই গোলকধাঁধায়।'

এবার ফেলুদা নিজেই বলল, 'ওর ভেতরে গাইড ছাড়া ঢুকলে নাকি আর বেরোনো যায় না?'

'তাই তো শুনিচি। একবার এক গোরাপল্টন—অনেকদিন আগে—মদটদ খেয়ে বাজি ধরে নাকি ঢুকেছিল ওর ভেতরে। বলেছিল কেউ যেন ধাওয়া না করে—ও নিজেই বেরিয়ে আসবে। দুদিন পরে ওর মৃতদেহ পাওয়া যায় ওই গোলকধাঁধার এক গলিতে।'

আমার বুকের ভেতরটা এর মধ্যেই ঢিপঢিপ করতে শুরু করেছে।

ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি একা গিয়েছিলে, না গাইড নিয়ে?'

'গাইড নিয়ে। তবে একাও যাওয়া যায়।'

'সত্যি?'

আমি তো অবাক। তবে ফেলুদার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

'কী করে একা যাওয়া যায় ফেলুদা?'

ফেলুদা চোখটা ঢুলুঢুলু করে ঘাড়টা দুবার নাড়িয়ে চুপ করে গেল। বুঝলাম ও আর কথা বলবে না। এখন ও শহরের পথঘাট বাড়িঘর লোকজন এক্কা টাঙ্গা সব খুব মন দিয়ে লক্ষ করছে।

ধীরুকাকা কুড়ি বছর আগে লখ্নৌতে প্রথম আসেন উকিল হয়ে। সেই থেকে এখানেই আছেন, এবং এখন নাকি ওঁর বেশ নামডাক। কাকিমা তিনবছর হল মারা গেছেন, আর ধীরুকাকার ছেলে জার্মানির ফ্র্যাংকফার্ট শহরে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। ওঁর বাড়িতে এখন উনি থাকেন, ওঁর বেয়ারা জগমোহন থাকে, আর রান্না করার বাবুর্চি আর একটা মালী। ওঁর বাড়িটা যেখানে সে জায়গাটার নাম সেকেন্দার বাগ, স্টেশন থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে। বাড়ির সামনে গেটের উপর লেখা—'ডি. কে. সান্যাল এম. এ., বি.এল. বি.

অ্যাডভোকেট'। গেট দিয়ে ঢুকে খানিকটা নুড়ি পাথর ঢালা রাস্তার পর একতলা বাড়ি, আর রাস্তার দুদিকে বাগান। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন মালী 'লন মোয়ার' দিয়ে বাগানের ঘাস কাটছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবা বললেন, 'ট্রেন জার্নি করে এসেছ, আজ আর বেরিয়ো না। কাল থেকে শহর দেখা শুরু করা যাবে।' তাই সারা দুপুর বাড়িতে বসে ফেলুদার কাছে তাসের ম্যাজিক শিখেছি। ফেলুদা বলে—'ইন্ডিয়ানদের আঙুল ইউরোপিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশি ফ্লেক্সিব্‌ল। তাই হাত সাফাইয়ের খেলাগুলো আমাদের পক্ষে রপ্ত করা অনেক সহজ।'

বিকেলে যখন ধীরুকাকার বাগানে ইউক্যালিপটাস্ গাছটার পাশে বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি, তখন গেটের বাইরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ পেলাম। ফেলুদা না দেখেই বলল 'ফিয়াট'। তারপর রাস্তার পাথরের উপর দিয়ে খচমচ খচমচ করতে করতে ছাই রঙের সুট পরা একজন ভদ্রলোক এলেন। চোখে চশমা, রং ফরসা আর মাথার চুলগুলো বেশির ভাগই সাদা। কিন্তু তাও দেখে বোঝা যায় যে বয়স বাবাদের চেয়ে খুব বেশি নয়।

ধীরুকাকা হেসে নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে বললেন, 'জগমোহন, আউর এক কুরসি লাও', তারপর বাবার দিকে ফিরে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই—ইনি ডক্টর শ্রীবাস্তব, আমার বিশিষ্ট বন্ধু।'

আমি আর ফেলুদা দুজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, 'নার্ভাস হয়ে আছে। তোর বাবাকে নমস্কার করতে ভুলে গেল।'

ধীরুকাকা বললেন, 'শ্রীবাস্তব হচ্ছেন অস্টিওপ্যাথ, আর একেবারে খাস্ লখনৌইয়া।'

ফেলুদা চাপা গলায় বলল, 'অস্টিওপ্যাথ মানে বুঝলি?'

আমি বললাম, 'না।'

'হাড়ের ব্যারামের ডাক্তার। অস্টিও আর অস্থি—মিলটা লক্ষ করিস। অস্থি মানে হাড় সেটা জানিস তো?'

'তা জানি।'

আরেকটা বেতের চেয়ার এসে পড়াতে আমরা সকলেই বসে পড়লাম। ডক্টর শ্রীবাস্তব হঠাৎ ভুল করে বাবার চায়ের পেয়ালাটা তুলে আরেকটু হলেই চুমুক দিয়ে ফেলতেন, এমন সময় বাবা একটু খুক্ খুক্ করে কাশাতে 'আই অ্যাম সো সরি' বলে রেখে দিলেন।

ধীরুকাকা বললেন, 'আজ যেন তোমায় একটু ইয়ে বলে মনে হচ্ছে। কোনও কঠিন কেসটেস দেখে এলে নাকি?'

বাবা বললেন, 'ধীরু, তুমি বাংলায় বলছ—উনি বাংলা বোঝেন বুঝি?'

ধীরুকাকা হেসে বললেন, 'ওরে বাবা, বোঝেন বলে বোঝেন! তোমার বাংলা আবৃত্তি একটু শুনিয়ে দাও না।'

শ্রীবাস্তব যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বললেন, 'আমি বাংলা মোটামুটি জানি। ট্যাগোরও পড়েছি কিছু কিছু।'

'বটে?'

'ইয়েস। গ্রেট পোয়েট।'

আমি মনে মনে ভাবছি। এই বুঝি কবিতার আলোচনা শুরু হয়, এমন সময় কাঁপা হাতে তারই জন্যে ঢালা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে শ্রীবাস্তব বললেন, 'কাল রাতে আমার বাড়িতে ডাকু আসিয়াছিল।'

ডাকু? ডাকু আবার কে? আমাদের ক্লাসে দক্ষিণা বলে একটা ছেলে আছে যার ডাকনাম ডাকু।

কিন্তু ধীরুকাকার কথাতেই ডাকু ব্যাপারটা বুঝে নিলাম।

'সেকী—ডাকাত তো মধ্য প্রদেশেই আছে বলে জানতাম। লখ্নৌ শহরে আবার ডাকাত এল কোথেকে ?'

'ডাকু বলুন, কি চোর বলুন। আমার অঙ্গুরীর কথা তো আপনি জানেন মিস্টার সানিয়াল ?'

'সেই পিয়ারিলালের দেওয়া আংটি ? সেটা কি চুরি গেল নাকি ?'

'না, না। লেকিন আমার বিশ্বাস কি, ওই আংটি নিতেই চোর আসিল।'

বাবা বললেন, 'কী আংটি ?'

শ্রীবাস্তব ধীরুকাকাকে বললেন, 'আপনি বোলেন। উর্দুভাষা এঁরা বুঝবেন না আর অত কথা আমার বাংলায় হোবে না।'

ধীরুকাকা বললেন, 'পিয়ারিলাল শেঠ ছিলেন লখ্নৌ-এর নামকরা ধনী ব্যবসায়ী। জাতে গুজরাটি। এককালে কলকাতায় ছিলেন। তাই বাংলাও অল্প অল্প জানতেন। ওর ছেলে মহাবীরের যখন বারো কি তেরো বছর বয়স, তখন তার একটা কঠিন হাড়ের ব্যারাম হয়। শ্রীবাস্তব তাকে ভাল করে দেন। পিয়ারিলালের স্ত্রী নেই, দুই ছেলের বড়টি টাইফয়েডে মারা যায়। তাই বুঝতেই পারছ, সবেধন নীলমণিটিকে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য শ্রীবাস্তবের উপর পিয়ারিলালের মনে একটা গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। তাই মারা যাবার আগে তিনি তাঁর একটা বহুমূল্য আংটি শ্রীবাস্তবকে দিয়ে যান।'

বাবা বললেন, 'কবে মারা গেছেন ভদ্রলোক ?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'লাস্ট জুলাই। তিনমাস হল। মে মাসে ফার্স্ট হার্ট অ্যাটাক হল। তাতেই প্রায় চলে গিয়েছিলেন। সেই টাইমে আংটি দিয়েছিলেন আমায়। দেবার পরে ভাল হয়ে উঠলেন। তারপর জুলাই মাসে সেকেন্ড অ্যাটাক হল। তখনও আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিন দিনে চলে গেলেন।...এই দেখুন—'

শ্রীবাস্তব তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা দেশলাই-এর বাক্সর চেয়ে একটু বড় নীল রঙের ভেলভেটের কৌটো বার করে ঢাকনাটা খুলতেই তার ভেতরটায় রোদ পড়ে রামধনুর সাতটা রঙের একটা চোখ ঝলসানো ঝিলিক খেলে গেল।

তারপর শ্রীবাস্তব এদিক ওদিক দেখে সামনে ঝুঁকে পড়ে খুব সাবধানে ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে আলতো করে ধরে আংটিটা বার করলেন।

দেখলাম আংটিটার উপরে ঠিক মাঝখানে একটা প্রায় চার আনির সাইজের ঝলমলে পাথর—নিশ্চয়ই হিরে—আর তাকে ঘিরে লাল নীল সবুজ সব আরও অনেকগুলো ছোট ছোট পাথর।

এত অদ্ভুত সুন্দর আংটি আমি কোনওদিন দেখিনি।

ফেলুদার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখি সে একটা শুকনো ইউক্যালিপটাসের পাতা নিয়ে কানের মধ্যে ঢুকিয়ে সেটাকে পাকাচ্ছে, যদিও তার চোখটা রয়েছে আংটির দিকে।

বাবা বললেন, 'দেখে তো মনে হয় জিনিসটা পুরনো। এর কোনও ইতিহাস আছে নাকি ?'

শ্রীবাস্তব একটু হেসে আংটিটা বাক্সে পুরে বাক্সটা পকেটে রেখে চায়ের পেয়ালাটা আবার হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'তা একটু আছে। এর বয়স তিনশো বছরের বেশি। এ আংটি ছিল আওরঙ্গজেবের।'

বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলেন কী! আমাদের আওরঙ্গজেব বাদশা ?'

শাজাহানের ছেলে আওরঙ্গজেব ?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'হাঁ—তবে আওরঙ্গজেব তখনও বাদশা বনেননি। গদিতে শাজাহান। সমরকন্দ দখল করবেন বলে ফৌজ পাঠাচ্ছেন বার বার—আর বার বার ডিফিট হচ্ছে। একবার আওরঙ্গজেবের আন্ডারে ফৌজ গেল। আওরঙ্গজেব মার খেলেন খুব। হয়তো মরেই যেতেন। এক সেনাপতি সেভ করল। আওরঙ্গজেব নিজের হাত থেকে আংটি খুলিয়ে তাকে দিলেন।'

'বাবা ! এ যে একেবারে গল্পের মতো।'

'হাঁ। আর পিয়ারিলাল ওই আংটি কিনলেন ওই সেনাপতির এক বংশধরের কাছ থেকে আগ্রাতে। দাম কত ছিল তা পিয়ারিলাল বলেননি। তবে—দ্যাট বিগ স্টোন ইজ ডায়মন্ড, আমি যাচাই করিয়ে নিয়েছি। বুঝতেই পারছেন কতো দাম হোবে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'কমপক্ষে লাখ দুয়েক। আওরঙ্গজেব না হয়ে যদি জাহাঙ্গির খাঁ হত, তা হলেও লাখ দেড়েক হত নিশ্চয়ই।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'তাইতো বলছি—কালকের ঘটনার পর খুব আপসেট হয়েছি। আমি একেলা মানুষ, রোগী দেখতে হামেশাই বাইরে যাচ্ছি। আজ যদি পুলিশকে বলি, কাল আমি বাইরে গেলে রাস্তায় কেউ যদি ইট পাটকেল ছুঁড়িয়ে মারে ? একবার ভেবেছিলাম কি কোনও ব্যাঙ্কে রেখিয়ে দিই। তারপর ভাবলাম—এত সুন্দর জিনিস বন্ধুবান্ধবকে দেখিয়েও আনন্দ। ওই জন্যেই তো রেখে দিলাম নিজের কাছে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'অনেককে দেখিয়েছেন ও আংটি ?'

'মাত্র তিনমাস হল তো পেলাম। আর আমার বাড়িতে খুব বেশি কেউ তো আসে না। যাঁরা এলেন—বন্ধুলোক, ভদ্রলোক, তাঁদেরই দেখিয়েছি।'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ইউক্যালিপটাসের মাথায় একটু রোদ লেগে আছে, তাও বেশিক্ষণ থাকবে না। শ্রীবাস্তবকে দেখছিলাম কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না।

ধীরুকাকা বললেন, 'চলুন ভিতরে গিয়ে বসা যাক। ব্যাপার নিয়ে একটু ভাবা দরকার।'

আমরা সবাই বাগান ছেড়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসলাম। ফেলুদাকে দেখে মনেই হচ্ছিল না যে ওর এই আংটির ব্যাপারটা একটুও ইন্টারেস্টিং লাগছে। ও সোফাতে বসেই পকেট

থেকে তাসের প্যাকেট বার করে হাতসাফাই প্র্যাকটিস করতে লাগল।

বাবা এমনিতে বেশি কথা বলেন না, কিন্তু যখন বলেন তখন বেশ ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় বলেন। বাবা বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কেন ভাবছেন যে আপনার ওই আংটিটা নিতেই ওরা এসেছিল ? আপনার অন্য কোনও জিনিস চুরি যায়নি ? এমনও তো হতে পারে যে ওরা সাধারণ চোর, টাকাকড়ি নিতেই এসেছিল ?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ব্যাপার কী বলি। বনবিহারীবাবু আছেন বলে এমনিতেই আমাদের পাড়ায় চোর-টোর আসে না। আর আমার পাশের বাড়িতে থাকেন মিস্টার ঝুনঝুনওয়ালা, আর তার পাশের বাড়িতে থাকেন মিস্টার বিলিমোরিয়া—বোথ ভেরি রিচ। আর সেটা তাদের বাড়ি দেখলেই বোঝা যায়। তাদের কাছে আমি কী ? তাদের বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়ি আসবে কেন চোর ?'

ধীরুকাকা বললেন, 'তারা যেমন ধনী, তেমনি তাদের পাহারার বন্দোবস্তও নিশ্চয়ই খুব জমকালো। সুতরাং চোর সে বাড়িতে যাবে কেন ? তারা তো বিরাট ধনদৌলতের আশায় যাবে না। শ' পাঁচেক টাকা মারতে পারলে তাদের ছ মাসের খোরাক হয়ে যায়। কাজেই আমার-আপনার বাড়িতে চোর আসার ব্যাপারে অবাক হবার কিছু নেই।'

শ্রীবাস্তব তবু যেন ভরসা পাচ্ছিলেন না। উনি বললেন, 'আমি জানি না মিস্টার সানিয়াল—আমার কেন জানি মনে হচ্ছে চোর ওই আংটি নিতেই এসেছিল। আমার পাশের ঘরের একটা আলমারি খুলেছিল। দেরাজ খুলেছিল। তাতে অন্য জিনিস ছিল। নিতে পারত। টাইম ছিল। আমার ঘুম ভাঙতে চোর পালিয়ে গেলো, একেবারে কিচ্ছু না নিয়ে। আর, কথা কী জানেন ?—'

শ্রীবাস্তব হঠাৎ থামলেন। তারপর ভ্রূকুটি করে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'পিয়ারিলাল যখন আমাকে আংটি দিয়েছিলেন, তখন মনে হল কী—উনি আংটি নিজের বাড়িতে রাখতে চাইলেন না। তাই আমাকে দিয়ে দিলেন। আউর—'

শ্রীবাস্তব আবার থেমে ভ্রূকুটি করলেন।

ধীরুকাকা বললেন—'আউর কেয়া, ডক্টরজি ?'

শ্রীবাস্তব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দ্বিতীয়বার যখন হার্ট অ্যাটাক হল, আর আমি ওঁকে দেখতে গেলাম, তখন উনি একটা কিছু আমাকে বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তবে একটা কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।'

'কী কথা ?'

'দুবার বলেছিলেন—"এ স্পাই..." "এ স্পাই..."।'

ধীরুকাকা সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন।

'না ডক্টরজি—পিয়ারিলাল যাই বলে থাকুক—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও চোর সাধারণ চোর, ছ্যাঁচড় চোর। আপনি বোধহয় জানেন না, ব্যারিস্টার ভূদেব মিত্তিরের বাড়িতেও রিসেন্ট্‌লি চুরি হয়ে গেছে। একটা আস্ত রেডিয়ো আর কিছু রুপোর বাসন-কোসন নিয়ে গেছে। তবে আপনার যদি সত্যিই নার্ভাস লাগে, তা হলে আপনি ও আংটি স্বচ্ছন্দে আমার জিম্মায় রেখে যেতে পারেন। আমার গোদরেজের আলমারিতে থাকবে ওটা, তারপর আপনার ভয় কেটে গেলে পর আপনি ওটা ফেরত নিয়ে যাবেন।'

শ্রীবাস্তব হঠাৎ হাঁফ ছেড়ে একগাল হেসে ফেললেন।

'আমি ওই প্রস্তাব করতেই এলাম, লেকিন নিজে থেকে বলতে পারছিলাম না। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, মিস্টার সানিয়াল। আপনার কাছে আংটি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব।'

শ্রীবাস্তব তাঁর পকেট থেকে আংটি বার করে ধীরুকাকাকে দিলেন, আর ধীরুকাকা সেটা

নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন।

এইবার ফেলুদা হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল।

'বনবিহারীবাবু কে?'

'পার্ডন?' শ্রীবাস্তব বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি বললেন না যে, বনবিহারীবাবু পাড়ায় আছেন বলে চোর-টোর আসে না—এই বনবিহারীবাবুটি কে? পুলিশ-টুলিশ নাকি?'

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'ও নো নো। পুলিশ না। তবে পুলিশের বাড়া। ইন্টারেস্টিং লোক। আগে বাংলাদেশে জমিদারি ছিল। তারপর সেটা গেল—আর উনি একটা ব্যবসা শুরু করলেন। বিদেশে জানোয়ার চালান দেবার ব্যবসা।'

'জানোয়ার?' বাবা আর ফেলুদা একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'হাঁ। টেলিভিশন, সার্কাস, চিড়িয়াখানা—এইসবের জন্য এদেশ থেকে অনেক জানোয়ার চালান যায় ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এইসব জায়গায়। অনেক ইন্ডিয়ান এই ব্যবসা করে। বনবিহারীবাবু ওতে অনেক টাকা করেছিলেন। তারপর রিটায়ার করে এখানে চলে এলেন আজ দু-তিন বছর। আর আসার সময় সঙ্গে কিছু জানোয়ার ভি নিয়ে এসে একটা বাড়ি কিনে সেখানে একটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানা বানিয়ে নিলেন।'

বাবা বললেন, 'বলেন কী—ভারী অদ্ভুত তো।'

'হাঁ। আর ওই চিড়িয়াখানার স্পেশালিটি হল কি, ওর প্রত্যেক জানোয়ার হল ভারী...ভারী...কী বলে—'

'হিংস্র?'

'হাঁ, হাঁ—হিংস্র।'

লখ্নৌতে এমনিতেই যে চিড়িয়াখানাটা আছে সেটা শুনেছি খুব ভাল। ওখানে বাঘ সিংহ নাকি খাঁচায় থাকে না। জাল দিয়ে ঘেরা দ্বীপের মতন তৈরি করা আছে, তার মধ্যে মানুষের তৈরি পাহাড় আর গুহার মধ্যে থাকে ওরা। তার উপর আবার এই প্রাইভেট চিড়িয়াখানা!

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ওয়াইল্ড ক্যাট আছে ওঁর কাছে। হাইনা আছে, কুমির আছে, স্করপিয়ন আছে। আওয়াজ শুনা যায়। চোর আসবে কী করিয়ে?'

এর পরে আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, ফেলুদা আমার আগেই সেটা জিজ্ঞেস করে ফেলল।

'চিড়িয়াখানাটা একবার দেখা যায় না?'

ধীরুকাকা ঠিক এই সময় ঘরে ফিরে এসে বললেন, 'সে তো খুব সহজ ব্যাপার। যে কোনও দিন গেলেই হল। উনি মানুষটি মোটেই হিংস্র নন।'

শ্রীবাস্তব উঠে পড়লেন। বললেন, 'লাটুশ রোডে আমার এক পেশেন্ট আছে। আমি চলি।'

আমরা সবাই শ্রীবাস্তবের সঙ্গে গেটের বাইরে অবধি গেলাম। ভদ্রলোক সকলকে গুড নাইট করে ধীরুকাকাকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁর ফিয়াট গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। বাবা আর ধীরুকাকা বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ফেলুদা সবে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে, এমন সময় হুশ্ করে একটা কালো গাড়ি আমাদের সামনে দিয়ে শ্রীবাস্তবের গাড়ির দিকে চলে গেল।

ফেলুদা বলল, 'স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড। নম্বরটা মিস্ করে গেলাম।'

আমি বললাম, 'নম্বর দিয়ে কী হবে?'

'মনে হল শ্রীবাস্তবকে ফলো করছে। রাস্তায় ওদিকটা কেমন অন্ধকার দেখছিস?

ওইখানে গাড়িটা ওয়েট করছিল। আমাদের গেটের সামনে গিয়ার চেঞ্জ করল দেখলি না?'

এই বলে ফেলুদা রাস্তা থেকে বাড়ির দিকে ঘুরল।

বাড়ির গেট থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। আমার আন্দাজ আছে, কেননা আমি স্কুলে অনেকবার হান্ড্রেড ইয়ার্ড্‌স দৌড়েছি। ধীরুকাকার বৈঠকখানায় বাতি জ্বলছে। জানালা দিয়ে ভিতরের দরজাটাও দেখা যাচ্ছে। বাবা আর ধীরুকাকাকে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখলাম। ফেলুদা দেখি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সেই জানালার দিকে দেখছে। ওর চোখে ভ্রূকুটি আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ানোর ভাবটা দেখে বুঝলাম ও চিন্তিত।

'জানিস তোপ্‌সে—'

আমার ডাকনাম কিন্তু আসলে ওটা নয়। ফেলুদা তপেশ থেকে তোপ্‌সে করে নিয়েছে।

আমি বললাম, 'কী?'

'আমি থাকতে এ ভুলটা হবার কোনও মানে হয় না।'

'কী ভুল?'

'ওই জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। গেট থেকে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরটা পরিষ্কার দেখা যায়। ইলেক্‌ট্রিক লাইট হলে তাও বা কথা ছিল, কিন্তু তোর কাকা আবার লাগিয়েছেন ফ্লুয়োরেসেন্ট।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'তোর বাবাকে দেখতে পাচ্ছিস?'

'শুধু মাথাটা। উনি যে চেয়ারে বসে আছেন।'

'ওই চেয়ারে দশ মিনিট আগে কে বসেছিল?'

'ডক্টর শ্রীবাস্তব।'

'আংটির কৌটোটা তোর বাবাকে দেবার সময় উনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মনে পড়ে?'

'এর মধ্যেই ভুলে যাব?'

'সেই সময় এই গেটের কাছে কেউ থেকে থাকলে তার পক্ষে ঘটনাটা দেখে ফেলা অসম্ভব নয়।'

'এই রে! কিন্তু কেউ যে ছিল সেটা তুমি ভাবছ কেন?'

ফেলুদা নিচু হয়ে নুড়ি পাথরের উপর থেকে একটা ছোট্ট জিনিস তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। হাতে নিয়ে দেখলাম সেটা একটা সিগারেটের টুকরো।

'মুখটা ভাল করে লক্ষ কর।'

আমি সিগারেটটা চোখের খুব কাছে নিয়ে এলাম, আর রাস্তার ল্যাম্পের অল্প আলোতেই যা দেখবার সেটা দেখে নিলাম।

ফেলুদা হাত বাড়িয়েই সিগারেটটা ফেরত নিয়ে নিল।

'কী দেখলি?'

'চারমিনার। আর যে লোকটা খাচ্ছিল, তার মুখে পান ছিল, তাই পানের দাগ লেগে আছে।'

'ভেরি গুড। চ' ভেতরে চ'।'

রাত্রে শোবার আগে ফেলুদা ধীরুকাকার কাছ থেকে আংটিটা চেয়ে নিয়ে সেটা আরেকবার ভাল করে দেখে নিল। ওর যে পাথর সম্বন্ধে এত জ্ঞান ছিল সেটা আমি জানতাম না। ল্যাম্পের আলোতে আংটিটা ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে লাগল—

'এই যে নীল পাথরগুলো দেখছিস, এগুলোকে বলে স্যাফায়ার, যার বাংলা নাম নীলকান্ত মণি। লালগুলো হচ্ছে চুনি অর্থাৎ রুবি, আর সবুজগুলো পান্না—এমারেল্ড। অন্যগুলি

যতদুর মনে হচ্ছে পোখরাজ—যার ইংরেজি নাম টোপ্যাজ। তবে আসল দেখবার জিনিস হল মাঝখানের ওই হিরেটা। এমন হিরে হাতে ধরে দেখার সৌভাগ্য সকলের হয় না।'

তারপর ফেলুদা আংটিটা বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের পাশের আঙুলে পরে বলল, 'আওরঙ্গজেবের আঙুল আর আমার আঙুলের সাইজ মিলে যাচ্ছে, দেখেছিস।'

সত্যিই দেখি ফেলুদার আঙুলে আংটিটা ঠিক ফিট করে গেছে।

ল্যাম্পের আলোতে ঝলমলে পাথরগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ফেলুদা বলল, 'কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে এ আংটির সঙ্গে কে জানে। তবে কী জানিস তোপ্‌সে—এর অতীতে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। এটা আওরঙ্গজেবের ছিল কি আলতামসের ছিল কি আক্রম খাঁর ছিল, সেটা আনিম্পরট্যান্ট। আমাদের জানতে হবে এর ভবিষ্যৎটা কী, আর বর্তমানে কোনও বাবাজি সত্যি করেই এর পেছনে লেগেছেন কি না, আর যদি লেগে থাকেন তবে তিনি কে এবং তাঁর কেন এই দুঃসাহস।'

তারপর ফেলুদা আংটি হাত থেকে খুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'যা, ফেরত দিয়ে আয়। আর এসে জানালাগুলো খুলে দে।'

২

পরদিন দুপুরে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমরা ইমামবড়া দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। বাবা আর ধীরুকাকা মোটরে গেলেন। গাড়িতে যদিও জায়গা ছিল, তবু ফেলুদা আর আমি দুজনেই বললাম যে আমরা টাঙ্গায় যাব।

সে দারুণ মজা। কলকাতায় থেকে তো ঘোড়ার গাড়ি চড়াই হয় না। সত্যি বলতে কী, আমি কোনও দিনই কোনওরকম ঘোড়ার গাড়ি চড়িনি। ফেলুদা অবিশ্যি চড়েছে। ও বলল কলকাতার ঠিকা গাড়ির চেয়ে টাঙ্গায় নাকি অনেক বেশি ঝাঁকুনি হয়, আর সেটা নাকি হজমের পক্ষে খুব ভাল।

'তোর কাকার বাবুর্চি যা ফার্স্ট ক্লাস রাঁধে, বুঝছি এখানে খাওয়ার ব্যাপারে হিসেব রাখাটা খুব মুশকিল হবে। কাজেই মাঝে মাঝে এই টাঙ্গা রাইডটার এমনিতেই দরকার হবে।'

নতুন শহরের রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে আর টাঙ্গার ঝাঁকুনি খেতে খেতে যে জায়গাটায় পৌঁছলাম, গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করাতে ও বলল সেটার নাম কাইজার-বাগ। ফেলুদা বলল, 'জর্মান আর উর্দুতে কেমন মিলিয়েছে দেখছিস?'

নবাবি আমলের যত প্রাসাদ-টাসাদ সব নাকি এই কাইজার-বাগের আশেপাশেই রয়েছে। গাড়োয়ান এদিকে ওদিকে আঙুল দেখিয়ে সব নাম বলে দিতে লাগল।

'উয়ো দেখিয়ে বাদশা মনজিল...উয়ো হ্যায় চাঁদিওয়ালি বরাদরি...উস্‌কো বোলতা লাখ্‌ফটক...'

কিছুদুর গিয়ে দেখি রাস্তাটা গেছে একটা বিরাট গেটের মধ্যে দিয়ে। গাড়োয়ান বলল, 'রুমি দরওয়াজা।'

রুমি দরওয়াজা পেরিয়েই 'মচ্ছি ভওয়ন' আর মচ্ছি ভওয়নেই হল বড়া-ইমামবড়া।

ইমামবড়ার সাইজ দেখে আমার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। এত বড় প্রাসাদ যে হতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না।

টাঙ্গা থেকেই ধীরুকাকার গাড়িটা দেখতে পেয়েছিলাম। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা বাবাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাবা আর ধীরুকাকা একজন লম্বা মাঝবয়সী লোকের সঙ্গে কথা বলছেন।

ফেলুদা হঠাৎ আমার কাঁধে হাত দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'ব্লাক স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড।'

সত্যিই তো! ধীরুকাকার গাড়ির পাশে একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

'মাডগার্ডে একটা টাট্‌কা ঘষটার দাগ দেখছিস?'

'টাট্‌কা কী করে জানলে?'

'চুনের গুঁড়ো সব ঝরে পড়েনি এখনও—লেগে রয়েছে। রং-করা পাঁচিল কিংবা গেটের গায়ে ঘষটে ছিল বোধ হয়। আজ সকালে যদি গাড়ি ধোওয়া না হয়ে থাকে, তা হলে ও দাগ কাল রাত্রে লেগে থাকতে পারে।'

ধীরুকাকা আমাদের দেখে বললেন, 'এসো আলাপ করিয়ে দিই। ইনিই বনবিহারীবাবু—যাঁর চিড়িয়াখানা আছে।'

আমি অবাক হয়ে নমস্কার করলাম। ইনিই সেই লোক! প্রায় ছ ফুট লম্বা, ফরসা রং, সরু গোঁফ, ছুঁচলো দাড়ি, চোখে সোনার চশমা। সব মিলিয়ে চেহারাটা বেশ চোখে পড়ার মতো।

আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে ভদ্রলোক বললেন, 'লক্ষ্মণের রাজধানী কেমন লাগছে খোকা? জানো তো, রামায়ণের যুগে লখ্‌নৌ ছিল লক্ষ্মণাবতী।'

ভদ্রলোকের গলার আওয়াজও দেখলাম বেশ মানানসই।

ধীরুকাকা বললেন, 'বনবিহারীবাবু চৌক-বাজারে যাচ্ছিলেন, আমাদের গাড়ি দেখে চলে এলেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ। দুপুরবেলাটা আমি বাইরে কাজ সারতে বেরোই। সকালসন্ধে আমার জানোয়ারগুলোর পেছনে অনেকটা সময় চলে যায়।'

ধীরুকাকা বললেন, 'আমরা ভাবছিলাম দলেবলে একবার আপনার ওখানে ধাওয়া করব। এদের খুব শখ একবার আপনার চিড়িয়াখানাটা দেখার।'

'বেশ তো। এনি ডে। আজই আসুন না। আমি তো কেউ এলে খুশিই হই। তবে অনেকেই দেখেছি ভয়েই আসতে চায় না। তাদের ধারণা আমার খাঁচা বুঝি জু গার্ডেনের খাঁচার মতো অত মজবুত নয়। তাই যদি হবে তো আমি আছি কী করে?'

এ কথায় ফেলুদা ছাড়া আমরা সকলেই হাসলাম। ফেলুদা আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় বলল, 'জানোয়ারের গন্ধ ঢাকার জন্য কষে আতর মেখেছে।'

স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটা দেখলাম বনবিহারীবাবুর নয়, কারণ তিনি তার পাশের একটা নীল অ্যাম্বাসাডর গাড়ি থেকে তাঁর ড্রাইভারকে ডেকে তার হাতে দুটো চিঠি দিয়ে বললেন ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনারা ইমামবড়া দেখবেন তো? তারপরই না হয় সোজা চলে যাব আমার ওখানে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'তা হলে আপনিও ভেতরে আসছেন আমাদের সঙ্গে?'

'চলুন না। নবাবের কীর্তিটা দেখে নেওয়া যাবে। সেই শিক্সটিথ্রিতে গিয়েছিলাম লখ্‌নৌতে আসার দুদিন বাদেই। তারপর আর যাওয়া হয়নি।'

গেট দিয়ে ঢুকে একটা বিরাট চত্বরের উপর দিয়ে প্রাসাদের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বনবিহারী বললেন, 'দুশো বছর আগে নবাব আসাফ-উদ্-দৌল্লা তৈরি করেছিলেন এই প্রাসাদ। ভেবেছিলেন আগ্রা দিল্লিকে টেক্কা দেবেন। ভারতবর্ষের সেরা প্রাসাদ-করনে-ওয়ালাদের নিয়ে একটা কম্পিটিশন করলেন। তারা সব নকশা পাঠাল। তার মধ্যে বেস্ট নকশা বেছে নিয়ে হল এই ইমামবড়া। বাহারের দিক দিয়ে মোগল প্রাসাদের সঙ্গে কোনও তুলনা হয় না, তবে সাইজের দিক থেকে একেবারে নাম্বার ওয়ান। এত বড় দরবার-ঘর পৃথিবীর কোনও প্রাসাদে নেই।'

দরবার-ঘরটা দেখে মনে হল তার মধ্যে অনায়াসে একটা ফুটবল গ্রাউন্ড ঢুকে যায়। আর একটা কুয়ো দেখলাম, অত বড় কুয়ো আমি কখনও দেখিনি। গাইড বলল অপরাধীদের ধরে ধরে ওই কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে নাকি তাদের শাস্তি দেওয়া হত।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল ভুলভুলাইয়া। এদিক ওদিক এঁকেবেঁকে সুড়ঙ্গ চলে গেছে সেগুলো এমন কায়দায় তৈরি যে, যতবারই এক একটা মোড় ঘুরছি, ততবারই মনে হচ্ছে যেন যেখানে ছিলাম সেইখানেই আবার ফিরে এলাম। একটা গলির সঙ্গে আরেকটা গলির কোনও তফাত নেই—দুদিকে দেয়াল, মাথার ওপরে নিচু ছাত, আর দেওয়ালের ঠিক মাঝখানটায় একটা করে খুপরি। গাইড বলল, নবাব যখন বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন, তখন ওই খুপরিগুলোতে পিদিম জ্বলত। রাত্তিরবেলা যে কী ভুতুড়ে ব্যাপার হবে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

ফেলুদা যে কেন বারবার পেছিয়ে পড়ছিল, আর দেওয়ালের এত কাছ দিয়ে হাঁটছিল সেটা বুঝতেই পারছিলাম না। আমিও গোলোকধাঁধাটা দেখতে দেখতে, আর তার মধ্যে লুকোচুরি খেলার কথা ভাবতে ভাবতে এত মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম যে ওর বিষয় খেয়ালই ছিল না। এর মধ্যে হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, 'আরে ফেলু কোথায় গেল?'

সত্যিই তো! পেছন ফিরে দেখি ফেলুদা নেই। আমার বুকের ভিতরটা টিপ্ করে উঠল। তারপর 'ফেলু, ফেলু' বলে বাবা দুবার ডাক দিতেই ও আমাদের পিছন দিকের একটা গলি দিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, 'অত তাড়াতাড়ি হাঁটলে গোলকধাঁধার প্ল্যানটা ঠিক মাথায় তুলে নিতে পারব না।'

গোলকধাঁধার শেষ গলিটার শেষে যে দরজা আছে, সেটা দিয়ে বেরোলেই ইমামবড়ার বিরাট ছাতে গিয়ে পড়তে হয়। গিয়ে দেখি সেখান থেকে প্রায় সমস্ত লখ্নৌ শহরটাকে দেখা যায়। আমরা ছাড়াও ছাতে কয়েকজন লোক ছিল। তাদের মধ্যে একজন অল্পবয়সী ভদ্রলোক ধীরুকাকাকে দেখে হেসে এগিয়ে এল।

ধীরুকাকা বললেন, 'মহাবীর যে—কবে এলে?'

ভদ্রলোককে দেখলে যদিও বাঙালি মনে হয় না, তবু তিনি বেশ পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'তিন দিন হল। এই সময়টাতে আমি প্রতি বছরই আসি। দেওয়ালিটা সেরে ফিরে যাই। এবারে দুজন বন্ধু আছেন, তাদের লখ্নৌ শহর দেখাচ্ছি।'

ধীরুকাকা বললেন, 'ইনি পিয়ারিলালের ছেলে—বোম্বাইতে অভিনয় করছেন।'

মহাবীর দেখলাম বনবিহারীবাবুর দিকে কী রকম যেন অবাক হয়ে দেখছেন—যেন ওকে আগে দেখেছেন, কিন্তু কোথায় সেটা মনে করতে পারছেন না।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'চেনা চেনা মনে হচ্ছে কি?'

মহাবীর বলল, 'হ্যাঁ—কিন্তু কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'তোমার স্বর্গত পিতার সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল বটে, তুমি তো তখন এখানে ছিলে না।'

মহাবীর যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলল, 'ও। তা হলে বোধহয় ভুল করছি। আচ্ছা, আসি তা হলে।'

মহাবীর নমস্কার করে চলে গেল। ভদ্রলোকের বয়স হয়তো ফেলুদার চেয়েও কিছুটা কম—আর চেহারা বেশ সুন্দর আর শক্ত। মনে হল নিশ্চয়ই এক্সারসাইজ করেন, কিংবা খেলাধুলা করেন।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আমার মনে হয় এবার আমার ওখানে গিয়ে পড়তে পারলে ভালই হয়। জানোয়ারগুলো যদি দেখতেই হয়, তা হলে আলো থাকতে থাকতে দেখাই ভাল।

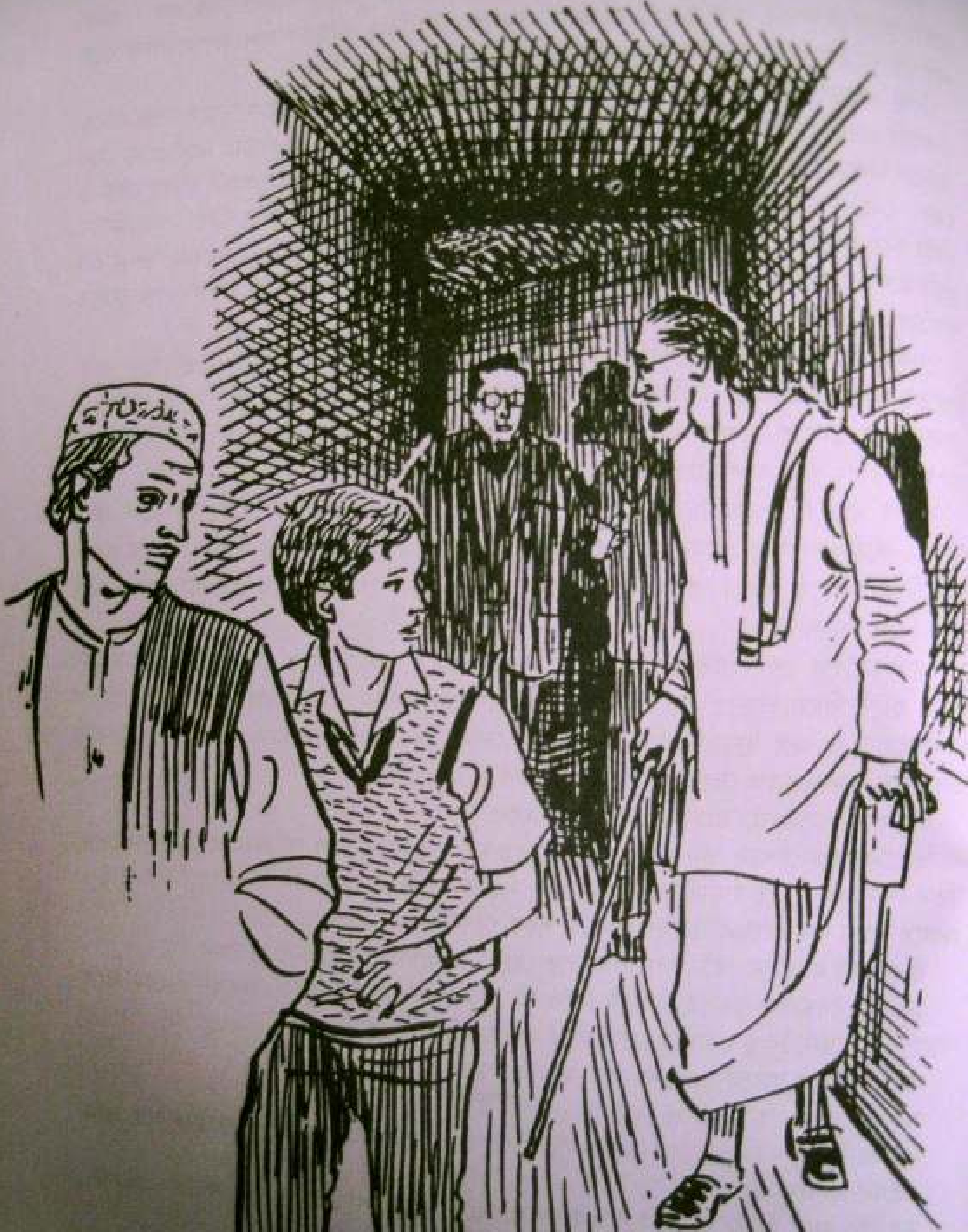

খাঁচাগুলোতে আলোর ব্যবস্থা এখনও করে উঠতে পারিনি।'

আমরা গাইডকে বকশিশ দিয়ে ছাত থেকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে একদম নীচে নেমে এলাম।

গেটের বাইরে এসে দেখলাম মহাবীর আরও দুজন ভদ্রলোককে নিয়ে সেই কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটায় উঠছে।

৩

বনবিহারীবাবুর বাড়িতে পৌঁছতে প্রায় চারটে বাজল। বাইরে থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই যে ভিতরে একটা চিড়িয়াখানা আছে, কারণ যা আছে তা বাড়ির পিছন দিকটায়।

'মিউটিনিরও প্রায় ত্রিশ বছর আগে এক ধনী মুসলমান সওদাগর এ বাড়ি তৈরি করেছিলেন' বনবিহারীবাবু বললেন। 'আমি বাড়িটা কিনি এক সাহেবের কাছ থেকে।'

দেখেই বোঝা যায় বাড়িটা অনেক পুরনো। আর দেওয়ালের গায়ে যে সব কারুকার্য আছে তা থেকে নবাবদের কথাই মনে হয়।

বাড়ির ভিতর ঢুকে বনবিহারীবাবু বললেন, 'আপনারা সবাই কফি খান তো? আমার বাড়িতে কিন্তু চায়ের পাট নেই।'

আমাকে বাড়িতে বেশি কফি খেতে দেওয়া হয় না, কিন্তু আমার খেতে খুব ভাল লাগে, তাই আমার তো মজাই হয়ে গেল। কিন্তু কফি পরে—আগে জানোয়ার দেখা।

বৈঠকখানা পেরিয়ে একটা বারান্দা, তার পরেই প্রকাণ্ড বাগান, আর সেই বাগানেই এদিকে ওদিকে রাখা বনবিহারীবাবুর সব খাঁচা। বাগানের মাঝখানে ছুঁচলো শিক দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর। সেটায় একটা কুমির রোদ পোহাচ্ছে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এটাকে বছর দশেক আগে মুঙ্গের থেকে এনেছিলাম একেবারে বাচ্চা অবস্থায়। প্রথমে আমার কলকাতার বাড়ির চৌবাচ্চায় ছিল। একদিন দেখি বেরিয়ে এসে একটা আস্ত বেড়ালছানা খেয়ে ফেলেছে।'

পুকুরের চারপাশ থেকে বাঁধানো রাস্তা অন্য খাঁচাগুলোর দিকে গেছে। একটা খাঁচার দিক থেকে ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ শুনে আমরা কুমির ছেড়ে সেইদিকেই গেলাম।

গিয়ে দেখি খাঁচার ভেতরে একটা মাঝারি গোছের কুকুরের সাইজের বেড়াল, তার চোখ দুটো সবুজ আর জ্বলজ্বলে, আর গায়ের রং ডোরাকাটা খয়েরি। এত বড় বেড়ালকে বাঘ বলতেই ইচ্ছে করে। বনবিহারীবাবু বললেন, 'এটার বাসস্থান আফ্রিকা। এটা কিনি কলকাতায় রিপন স্ট্রিটের এক ফিরিঙ্গি পশু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। এ জিনিস আলিপুরের চিড়িয়াখানাতেও নেই।'

বেড়ালের পর হাইনা, হাইনার পর নেকড়ে, নেকড়ের পর আমেরিকান র‍্যাট্‌ল স্নেক। দারুণ বিষাক্ত সাপ। একরকম সরু ছুঁচলো শামুক পুরী থেকে আমরা অনেকবার এনেছি; এই সাপের ল্যাজের ডগায় সেইরকম একটা শামুকের মতো জিনিস আছে। সাপটা এদিক ওদিক চলার সময় ল্যাজটাকে কাঁপায়, আর তাতে ওই জিনিসটা মাটিতে লেগে একটা ঝুমঝুমির মতো কর্‌কর্ কর্‌কর্ শব্দ হয়। আমেরিকার জঙ্গলে অনেকদূর থেকেই এরকম শব্দ শুনতে পেয়ে নাকি লোকে বুঝতে পারে যে র‍্যাট্‌ল স্নেক ঘোরাফেরা করছে।

আরও দুটো জিনিস দেখে ভয়ে গা শিউরে উঠল। একটা কাচের বাক্সর মধ্যে দেখলাম নীল রঙের বিশ্রী বিরাট এক কাঁকড়া বিছে। এটাও আমেরিকার বাসিন্দা। এর নাম ব্লু স্করপিয়ন। আর আরেকটা কাচের বাক্স দেখলাম, একটা মানুষের আঙুল ফাঁক করা হাতের

মতো বড় কালো রোঁয়াওয়ালা মাকড়সা—আফ্রিকার বিষাক্ত 'ব্ল্যাক উইডো' মাকড়সা।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ওই বিছে আর ওই মাকড়সা—ওই দুটোরই বিষ হল যাকে বলে নিউরোটক্সিক। অর্থাৎ এক কামড়ে একটা আস্ত মানুষ মেরে ফেলার শক্তি রাখে ওই দুটোই।'

চিড়িয়াখানা দেখে আমরা বৈঠকখানায় এলাম। আমরা সোফায় বসার পর নিজে একটা চেয়ারে বসে বনবিহারীবাবু বললেন, 'রাত্রে চারিদিক নিস্তব্ধ হলে মাঝে মাঝে আমার বাগান থেকে বনবেড়ালের ফ্যাঁসফ্যাঁসানি, হাইনার হাসি, নেকড়ের খ্যাঁকরানি আর র‍্যাট্‌ল স্নেকের করকরানি মিলে এক অদ্ভুত কোরাস শুনতে পাই। তাতে ঘুমটা হয় বড় আরামের। এরকম বডিগার্ডের সম্ভার আর কজনের আছে বলুন। অবিশ্যি চোর এলে এরা খুব হেল্‌প করতে পারে না বটে, কারণ এরা খাঁচায় বন্দি। তার জন্যে আমার আলাদা ব্যবস্থা আছে।—বাদশা!

হাঁক দিতেই পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল এক বিরাট কালো হাউন্ড কুকুর। এটাকেই নাকি বনবিহারীবাবু পাহারার জন্য রেখেছেন। শুধু যে বাড়ি পাহারা তা নয়—চিড়িয়াখানারও কোনও অনিষ্ট নাকি এই বাদশা করতে দেবে না।

ফেলুদা আমার পাশেই বসে ছিল। কুকুরটা দেখে আমার কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, 'ল্যাব্রেডর হাউন্ড। বাস্কারভিলের কুকুরের জাত।'

বাবা এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি। এবার বললেন, 'আচ্ছা, সত্যিই আপনার এইসব হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে বাস করতে ভাল লাগে?'

বনবিহারীবাবু তাঁর পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, 'কেন লাগবে না বলুন? ভয়টা কীসের? এককালে কত বাঘ ভালুক মেরেছি জানেন? ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল্‌ ছাড়া মারতুম না। অব্যর্থ টিপ ছিল। একবার কী যে ভীমরতি ধরল। চাঁদার জঙ্গলে এক মার্কিনি সাহেবকে বড়াই করে টিপ দেখাতে গিয়ে দেড়শো গজ দূর থেকে এক হরিণ মেরে ফেললুম। আর তারপর সে কী অনুতাপ! সেই থেকে শিকার ছেড়ে দিয়েছি। তবে জানোয়ার ছাড়াও থাকতে পারব না, তাই চালান দেবার ব্যবসা ধরলুম। ব্যবসা যখন ছাড়লুম, তখন বাধ্য হয়েই বাড়িতে চিড়িয়াখানা করলুম। এদের নিয়ে বাস করার কী আনন্দ জানেন? এরা যে হিংস্র ও বিষাক্ত, সেটা সকলেরই জানা। এরা তো নিরীহ ভালমানুষ বলে চালাতে চাইছে না নিজেদের! অথচ মানুষের মধ্যে দেখুন—একজনকে আপনি ভাবছেন সৎ লোক, শেষে হঠাৎ বেরিয়ে গেল সে আসলে একটা ক্রিমিনাল। অন্তরঙ্গ বন্ধুকেই কি আর আজকের দিনে বিশ্বাস করার জো আছে? তাই স্থির করেছি জানোয়ার পরিবেষ্টিত হয়েই বাকি জীবনটা কাটাব—তাতে শান্তি অনেক বেশি। আমি মশাই সাতেও নেই পাঁচেও নেই। নিজের সম্পত্তি একা নিজে ভোগ করছি—তাতে কে কী ভাবছে না ভাবছে সেই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে? তবে শুনিচি আমার এ চিড়িয়াখানার দৌলতে পাড়ায় নাকি চুরিচামারি বন্ধ হয়ে গেছে। তা হলে বলতে হয় অজান্তে আমি লোকের উপকারই করছি!'

এই শেষ কথাটা শুনে আমি প্রথমে ধীরুকাকার দিকে, তারপর ফেলুদার দিকে চাইলাম। বনবিহারীবাবু কি তা হলে শ্রীবাস্তবের বাড়ির ঘটনাটা জানেন না?

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, কারণ বনবিহারীবাবুর বেয়ারা কফি আর মিষ্টি এনে দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবাস্তব এসে হাজির হলেন।

সকলকে নমস্কার-টমস্কার করে ধীরুকাকাকে বললেন, 'আপনাদের বাড়ির কাছেই কেলভিন রোডে একটি ছেলে গাছ থেকে পড়ে হাত ভেঙেছে। তাকে দেখে আপনার বাড়ি গিয়ে দেখি আপনারা ফেরেননি। তাই এখানে চলে এলাম।'

শ্রীকৃষ্ণকাকা শ্রীবাস্তবের দিকে চোখ দিয়ে একটা ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর আংটি ঠিকই আছে।

বনবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখলাম শ্রীবাস্তবের যথেষ্ট আলাপ। ছোট শহরে পাড়ার লোকেদের পরস্পরের মধ্যে আলাপটা বোধহয় সহজেই হয়।

শ্রীবাস্তব ঠাট্টার সুরে বললেন, 'বনবিহারীবাবু, আপনার পাহারাদারেরা কিন্তু আজকাল ফাঁকি দিচ্ছে।'

বনবিহারীবাবু একটু অবাক হয়েই বললেন, 'কী রকম?'

'কাল আমার বাড়িতে চোর এল, আর আপনার একটি জানোয়ার কিছু সাড়াশব্দ করল না।'

'সে কী? চোর? আপনার বাড়িতে? কখন?'

'রাত তিনটের কাছাকাছি। নেয়নি কিছুই। ঘুমটা ভেঙে গেল আমার, তাই পালিয়ে গেল।'

'না নিলেও—খুব এক্সপার্ট বলতে হবে। আমার 'বাদশা' অন্তত খুবই সজাগ। দুশো গজের মধ্যে আপনার বাড়ি—আর চোর এলেও আমার কম্পাউন্ডের পিছন দিয়েই তাকে যেতে হবে।'

'যাক গে! আপনাকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখলাম।'

কফির সঙ্গে একরকম মিষ্টি দিয়ে গিয়েছিল প্লেটে। শ্রীবাস্তব বললেন সেটার নাম সান্ডিলা লাড্ডু।

'সান্ডিলা লাড্ডু, গুলাবি রেউরি, আর ভুনা পেঁড়া—এই তিন মিষ্টি হল লখ্‌নৌয়ের স্পেশালিটি।'

আমার নিজের মিষ্টি জিনিসটা খুব ভাল লাগে না, তাই আমি ও সব কথায় বিশেষ কান না দিয়ে বনবিহারীবাবুকে লক্ষ করছিলাম। ওঁকে যেন একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। ফেলুদা কিন্তু দেখি এর মধ্যেই দুটো লাড্ডু শেষ করে নিয়ে, আমার কফির পেয়ালার উপর মাছি তাড়াবার মতো করে হাত নাড়িয়ে দারুণ কায়দায় আমার প্লেট থেকে আরেকটা লাড্ডু তুলে নিল।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ শ্রীবাস্তবের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার সেই বাদশাহী আংটি ঠিক আছে তো?'

শ্রীবাস্তবের হঠাৎ বিষম লেগে গেল। তারপর কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে কাশিটাকে হাসিতে চেঞ্জ করে বললেন—'ও বাবা—আপনার দেখি মনে আছে!'

বনবিহারীবাবু পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'মনে থাকবে না! আমার যদিও ও সব ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট্ নেই, তবুও ওরকম আংটি তো সচরাচর দেখা যায় না।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আংটি ঠিকই আছে। ওর ভ্যালু আমার জানা আছে।'

বনবিহারীবাবু এবার হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, 'এক্সকিউজ মি—আমার বেড়ালের খাবার সময় হয়ে গেছে।'

এ কথার পর আর থাকা যায় না—তাই আমরাও উঠে পড়লাম।

বাইরে এসে একজন লোককে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে বনবিহারীবাবুর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম। তার যে দারুণ মাস্‌ল সেটা গায়ে জামা থাকলেও বোঝা যায়। শুনলাম তার নাম নাকি গণেশ গুহ। বনবিহারীবাবুর যখন জানোয়ার চালান দেবার কারবার ছিল তখন থেকেই নাকি ইনি আছেন ; এখন নাকি চিড়িয়াখানা দেখাশোনা করেন।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'গণেশকে ছাড়া আমার চিড়িয়াখানা মেনটেন করা হত না। ওর

ভয় বলে কোনও বস্তুই নেই। একবার ওয়াইল্ড ক্যাটের আঁচড় খাওয়া সত্ত্বেও ও আমার চাকরি ছাড়েনি।'

আমরা যখন গাড়িতে উঠছি তখন বনবিহারীবাবু বললেন, 'আপনারা আসাতে খুব ভাল লাগল। মাঝে মাঝে এসে পড়বেন না হয়! এখন এখানেই আছেন তো?'

বাবা বললেন, 'কদিন আছি। তারপর ভাবছি এদের একবার হরিদ্বারটা দেখিয়ে আনব।'

'বটে? লছমনঝুলা থেকে একটা বারো ফুট পাইথনের খবর এসেছে। আমিও তাই একবার ওদিকটায় যাব যাব করছিলাম।'

শ্রীবাস্তবকে আমরা ওঁর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলাম। ঠিক সেই সময় বনবিহারীবাবুর বাড়ির দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম।

ফেলুদা একটা হাই তুলে বলল, 'হাইনা।'

বাপরে!—একেই বলে হাইনার হাসি!

শ্রীবাস্তব বললেন তাঁর নাকি প্রথম প্রথম এই হাসি শুনে গা ছম্ ছম্ করত, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

'আপনার বাড়িতে কাল আর কোনও উপদ্রব হয়নি তো?' ধীরুকাকা প্রশ্ন করলেন।

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'নো, নো। নাথিং।'

আমরা যখন বাড়িতে ফিরলাম তখন প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে শুনতে পেলাম দূর থেকে একটা ঢাক-ঢোলের শব্দ আসছে। ধীরুকাকা বললেন, 'দেওয়ালির সময় এখানে রামলীলা হয়। এটা তারই প্রিপারেশন হচ্ছে।'

আমি বললাম 'রামলীলা কী রকম?'

'প্রায় দশটা মানুষের সমান উঁচু একটা রাবণ তৈরি করে তার ভিতর বারুদ বোঝাই করা হয়। তারপর দুজন ছেলেকে মেকআপ-টেকআপ করে রাম লক্ষ্মণ সাজায়। তারা রথে চড়ে এসে তীর দিয়ে রাবণের দিকে তাগ করে মারে—আর সেই সঙ্গে রাবণের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর গা থেকে তুবড়ি হাউই চরকি রংমশাল ছড়াতে ছড়াতে রাবণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে একটা দেখবার জিনিস!'

বাড়িতে ঢুকতে বেয়ারা শ্রীবাস্তবের আসার খবরটা দিল। তারপর বলল, 'আউর এক সাধুবাবা ভি আয়া থা। আধঘণ্টা বইঠ্‌কে চলা গিয়া।'

'সাধুবাবা?'

ধীরুকাকার ভাব দেখে বুঝলাম উনি কোনও সাধুবাবাকে এক্সপেক্ট করছিলেন না।

'কোথায় বসেছিলেন?'

বেয়ারা বলল, 'বৈঠকখানায়।'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম করেছিলেন?'

বেয়ারা তাতেও বলল হ্যাঁ।

'তাজ্জব ব্যাপার!'

হঠাৎ কী মনে করে ধীরুকাকা ঝড়ের মতো শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর গোদরেজ আলমারি খোলার শব্দ পেলাম। আর তার পরেই শুনলাম ধীরুকাকার চিৎকার—

'সর্বনাশ!'

বাবা, আমি আর ফেলুদা প্রায় একসঙ্গে হুড়মুড় করে ধীরুকাকার ঘরে ঢুকলাম। গিয়ে দেখি উনি আংটির কৌটোটা হাতে নিয়ে চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে আছেন।

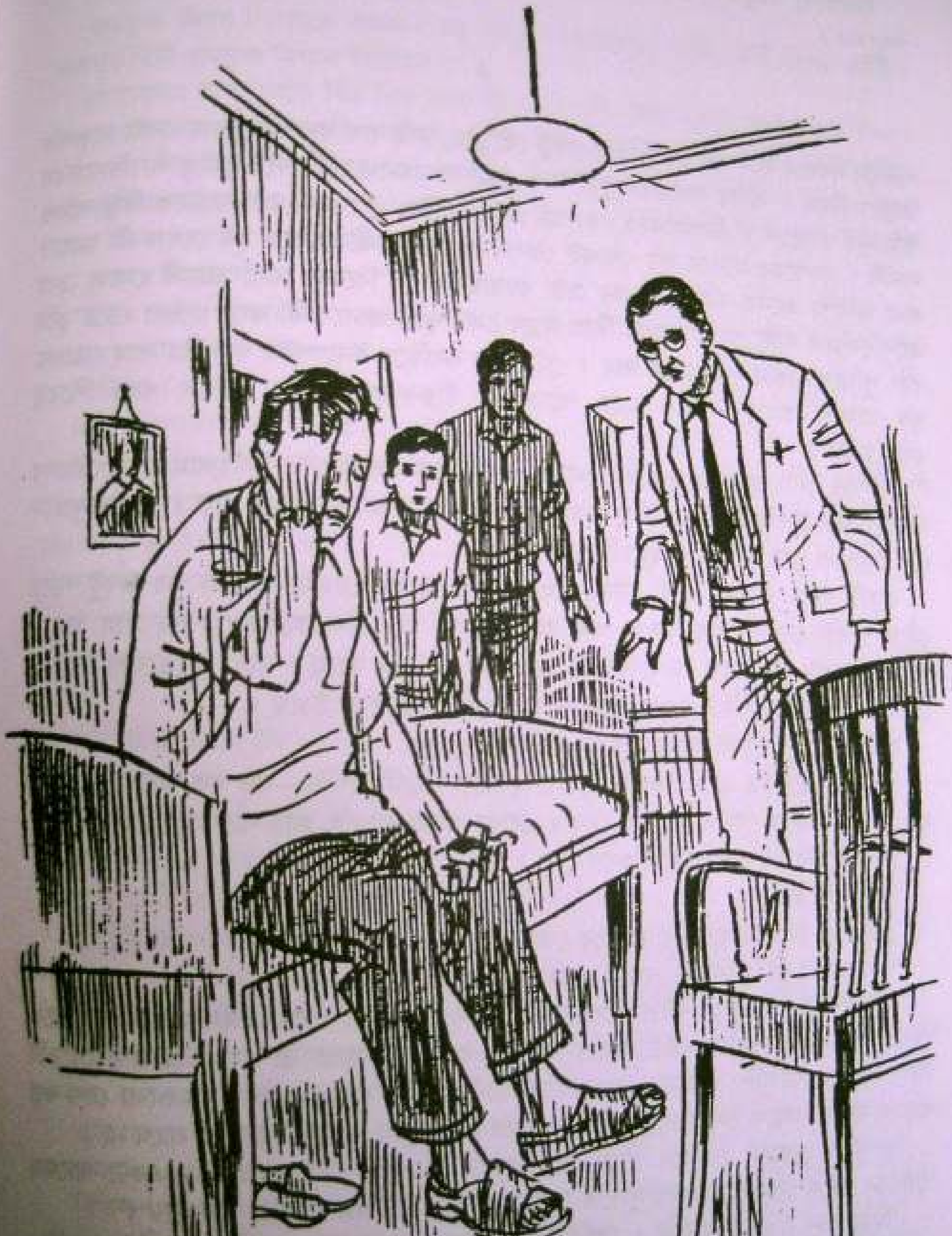

কৌটোর ঢাকনা খোলা, আর তার ভিতরে আংটি নেই।

ধীরুকাকা কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে ধপ্ করে তাঁর খাটের উপর বসে পড়লেন।

৪

পরদিন সকালে মনে হল যে শীতটা একটু বেড়েছে, তাই বাবা বললেন গলায় একটা মাফ্‌লার জড়িয়ে নিতে। বাবার কপালে ভ্রুকুটি আর একটা অন্যমনস্ক ভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম যে উনি খুব ভাবছেন। ধীরুকাকাও কোথায় জানি বেরিয়ে গেছেন—আর কাউকে কিছু বলেও যাননি। কালকের ঘটনার পর থেকেই কেবল বললেন—শ্রীবাস্তবকে মুখ দেখাব কী করে? বাবা অবিশ্যি অনেক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। 'বিকেল বেলা সন্ন্যাসী সেজে চোর এসে তোমার বাড়ি থেকে আংটি নিয়ে যাবে সেটা তুমি জানবে কী করে। তার চেয়ে তুমি বরং পুলিশে একটা খবর দিয়ে দাও। তুমি তো বলছিলে ইন্‌স্পেক্টর গরগরির সঙ্গে তোমার খুব আলাপ আছে।' এও হতে পারে যে ধীরুকাকা হয়তো পুলিশে খবর দিতেই বেরিয়েছেন।

সকালে যখন চা আর জ্যামরুটি খাচ্ছি, তখন বাবা বললেন, 'ভেবেছিলাম আজ তোদের রেসিডেন্সিটা দেখিয়ে আনব, কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে আজকের দিনটা যাক। তোরা দুজনে বরং কোথাও ঘুরে আসিস কাছাকাছির মধ্যে।'

কথাটা শুনে আমার একটু হাসিই পেয়ে গেল, কারণ ফেলুদা বলছিল ওর একটু পায়ে হেঁটে শহরটা দেখার ইচ্ছে আছে, আর আমিও মনে মনে ঠিক করেছিলাম ওর সঙ্গে যাব। আমি জানতাম শুধু শহর দেখা ছাড়াও ওর অন্য উদ্দেশ্য আছে। আমি সন্ধেবেলা থেকেই দেখছি ওর চোখের দৃষ্টিটা মাঝে মাঝে কেমন জানি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে।

আটটার একটু পরেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

গেটের কাছাকাছি এসে ফেলুদা বলল, 'তোকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি—বক্ বক্ করলে বা বেশি প্রশ্ন করলে তোকে ফেরত পাঠিয়ে দেব। বোকা সেজে থাকবি, আর পাশে পাশে হাঁটবি।'

'কিন্তু ধীরুকাকা যদি পুলিশে খবর দেন?'

'তাতে কী হল?'

'ওরা যদি তোমার আগে চোর ধরে ফেলে?'

'তাতে আর কী? নিজের নামটা চেঞ্জ করে ফেলব!'

ধীরুকাকার বাড়িটা যে রাস্তায় সেটার নাম ফ্রেজার রোড। বেশ নির্জন রাস্তাটা। দুদিকে গেট আর বাগান-ওয়ালা বাড়ি, তাতে শুধু যে বাঙালিরা থাকে তা নয়। ফ্রেজার রোডটা গিয়ে পড়েছে ডাপ্‌লিং রোডে। লখ্‌নৌতে একটা সুবিধে আছে—রাস্তার নামগুলো বেশ বড় বড় পাথরের ফলকে লেখা থাকে। কলকাতার মতো খুঁজে বার করতে সময় লাগে না।

ডাপ্‌লিং রোডটা যেখানে গিয়ে পার্ক রোডে মিশেছে, সেই মোড়টাতে একটা পানের দোকান দেখে ফেলুদা হেলতে দুলতে সেটার সামনে গিয়ে বলল, 'মিঠা পান হ্যায়?'

'মিঠা পান? নেহি, বাবুজি। লেকিন মিঠা মাসাল্লা দেকে বানা দেনে সেকতা।'

'তাই দিজিয়ে।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'বাংলা দেশ ছাড়লেই এই একটা প্রবলেম।'

পানটা কিনে মুখে পুরে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ ভাই, আমি এ-শহরে নতুন লোক। এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনটা কোথায় বলতে পার?'

ফেলুদা অবিশ্যি হিন্দিতে প্রশ্ন করছিল, আর লোকটাও হিন্দিতে জবাব দিয়েছিল, কিন্তু আমি বাংলাতেই লিখছি।

দোকানদার বলল, 'রামকিষণ মিসির ?'

'রামকৃষ্ণ মিশন। শহরে একজন বড় সাধুবাবা এসেছেন, আমি তাঁর খোঁজ করছি। শুনলাম তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে উঠেছেন।'

দোকানদার মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে কী জানি বলে বিড়ি বাঁধতে আরম্ভ করে দিল। কিন্তু দোকানের পাশেই একটা খাটিয়ায় একটা ইয়াবড় গোঁফওয়ালা লোক একটা পুরনো মরচে ধরা বিস্কুটের টিন বাজিয়ে গান করছিল, সে হঠাৎ ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করল, কালো গোঁফদাড়িওয়ালা কালো চশমা পরা সাধু কি ? তাই যদি হয় তা হলে তাকে কাল সন্ধেবেলা টাঙ্গার স্ট্যান্ড কোথায় বলে দিয়েছিলাম।

'কোথায় টাঙ্গার স্ট্যান্ড ?'

'এখান থেকে পাঁচ মিনিট। ওই দিকে প্রথম চৌমাথাটায় গেলেই সার সার গাড়ি দাঁড়ানো আছে দেখতে পাবেন।'

'শুক্রিয়া !'

শুক্রিয়া কথাটা প্রথম শুনলাম। ফেলুদা বলল ওটা হল উর্দুতে থ্যাঙ্ক ইউ।

টাঙ্গা স্ট্যান্ডে পৌঁছে সাতটা টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করার পর আট বারের বার সাতান্ন নম্বর গাড়ির গাড়োয়ান বলল যে গতকাল সন্ধ্যায় একজন গেরুয়াপরা দাড়িগোঁফওয়ালা লোক তার গাড়ি ভাড়া করেছিল বটে।

'কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে সাধুবাবাকে ?'—ফেলুদা প্রশ্ন করল।

গাড়োয়ান বলল, 'ইস্টিশান।'

'স্টেশন ?'

'হাঁ।'

'কত ভাড়া এখান থেকে ?'

'বারো আনা।'

'কত টাইম লাগবে পৌঁছুতে ?'

'দশ মিনিটের মতো।'

'চার আনা বেশি দিলে আট মিনিটে পৌঁছে দেবে ?'

'টিরেন পাকাড়না হ্যায় কেয়া ?'

'টিরেন বলে টিরেন ! বঢ়িয়া টিরেন—বাদশাহী এক্সপ্রেস !'

গাড়োয়ান একটু বোকার মতো হেসে বলল, 'চলিয়ে—আট মিনিটমে পৌঁছা দেঙ্গে !'

গাড়ি ছাড়বার পর ফেলুদাকে একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই সাধুবাবা কি এখনও বসে আছেন স্টেশনে আংটি নিয়ে ?'

এটা বলতে ফেলুদা আমার দিকে এমন কট্‌মট্‌ করে চাইল যে আমি একেবারে চুপ মেরে গেলাম।

কিছুক্ষণ যাবার পর ফেলুদা গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 'সাধুবাবার সঙ্গে কোনও মালপত্তর ছিল কি ?'

গাড়োয়ান একটুক্ষণ ভেবে বলল, 'মনে হয় একটা বাক্স ছিল। তবে, বড় নয়, ছোট !'

'হুঁ।'

স্টেশনে পৌঁছে টিকিট ঘরের লোক, গেটের চেকার, কুলি-টুলি এদের কাউকে জিজ্ঞেস করে কোনও ফল হল না। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বাঙালি ; তিনি বললেন, 'আপনি কি

পবিত্রানন্দ ঠাকুরের কথা বলছেন ? যিনি দেরাদুনে থাকেন ? তিনি তো তিনদিন হল সবে এসেছেন। তাঁর তো এখনও ফিরে যাবার সময় হয়নি। আর তাঁর সঙ্গে তো দেদার সাঙ্গোপাঙ্গ চেলাচামুণ্ডা !'

সবশেষে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমের যে দারোয়ান, তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল একজন গেরুয়াপরা দাড়িওয়ালা লোক গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিল বটে।

'ওয়েটিংরুমে বসেছিলেন ?'

'আজ্ঞে না। বসেননি।'

'তবে ?'

'বাথরুমে ঢুকেছিলেন। হাতে একটা ছোট বাক্স ছিল।'

'তারপর ?'

'তারপর তো জানি না।'

'সে কী ? বাথরুমে ঢোকার পর তাকে আর দেখোনি ?'

'দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'তুমি এখানেই ছিলে তো ?'

'তা তো থাকবই। ডুন এক্সপ্রেস আসছে তখন। ঘরে অনেক লোক যে।'

'তা হলে হয়তো খেয়াল করোনি। এমনও হতে পারে তো ?'

'তা পারে।'

কিন্তু লোকটার হাবভাব দেখে মনে হল যে সে বলতে চায় যে সাধুবাবা বেরোলে সে নিশ্চয়ই দেখতে পেত। কিন্তু তা হলে সে সাধুবাবা গেলেন কোথায় ?

স্টেশনে আর বেশিক্ষণ থেকে এ রহস্যের উত্তর পাওয়া যাবে না, তাই আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এখানেও বাইরে টাঙ্গার লাইন, আর তারই একটাতে আমরা উঠে পড়লাম। টাঙ্গা জিনিসটাকে আর অবজ্ঞা করতে পারছিলাম না, কারণ সাতান্ন নম্বরের গাড়োয়ান আমাদের ঠিক সাত মিনিট সাতান্ন সেকেন্ডে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল।

এবারেও কিন্তু গাড়ি ছাড়বার পরে আমার মুখ থেকে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে পড়ল—

'সাধুবাবা বাথরুমে গিয়ে ভ্যানিস করে গেল ?'

ফেলুদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছিক্ করে খানিকটা পানের পিক রাস্তায় ফেলে দিয়ে বলল, 'তা হতে পারে। আগেকার দিনে তো সাধুসন্ন্যাসীদের ভ্যানিস-ট্যানিস করার ক্ষমতা ছিল বলে শুনেছি।'

বুঝলাম ফেলুদা কথাটা সিরিয়াসলি বলছে না, যদিও ওর মুখ দেখে সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই।

স্টেশনের গেট ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই একটা ব্যান্ডের আওয়াজ পেলাম। ভোঁপ্পর ভোঁপ্পর ভোঁপ্পর ভোঁপ্পর...আওয়াজটা এগিয়ে আসছে।

তারপর দেখলাম আমাদেরই মতো একটা টাঙ্গা, কিন্তু সেটার গায়ে কাগজের ফুল, বেলুন, ফ্ল্যাগ—এই সব দিয়ে খুব সাজানো হয়েছে। বাজনাটা বাজছে একটা লাউডস্পিকারে, আর একটা রঙিন কাগজের গাধার টুপি পরা লোক গাড়ির ভিতর থেকে গোছা গোছা করে কী একটা ছাপানো কাগজ রাস্তার লোকের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

ফেলুদা বলল, 'হিন্দি ফিল্মের বিজ্ঞাপন।'

সত্যিই তাই। গাড়িটা আরেকটু কাছে আসতেই রংচঙে ছবি আঁকা বিজ্ঞাপনের বোর্ডটা দেখতে পেলাম। ছবির নাম 'ডাকু মনসুর।'

হ্যান্ডবিলের দু-একটা আমাদের গাড়ির ভিতর এসে পড়ল, আর ঠিক সেই সময় একটা দলাপাকানো সাদা কাগজ বেশ জোরে গাড়ির মধ্যে এসে ফেলুদার বুক পকেটে লেগে গাড়ির মেঝেতে পড়ল।

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'লোকটাকে দেখেছি ফেলুদা! কাবলিওয়ালার পোশাক, কিন্তু—'

আমার কথা শেষ হল না। ফেলুদা চট করে কাগজটা তুলে নিয়ে একলাফে চলন্ত টাঙ্গা থেকে রাস্তায় নেমে পাঁই পাঁই করে যে দিকে লোকটাকে দেখা গিয়েছিল সেইদিকে ছুটে গেল। ভিড়ের মধ্যে কলিশন বাঁচিয়ে একটা মানুষ কত স্পিডে ছুটতে পারে সেটা এই প্রথম দেখলাম।

এর মধ্যে অবিশ্যি টাঙ্গাওয়ালা গাড়ি থামিয়েছে। আমি আর কী করব? অপেক্ষা করে রয়েছি। ব্যান্ডের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে আসছে, তবে রাস্তায় কতগুলো বাচ্চা বাচ্চা ছেলে এখনও হ্যান্ডবিল কুড়োচ্ছে। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে গাড়োয়ানকে ইশারা করে চালানোর হুকুম দিয়ে এক লাফে গাড়িতে উঠে ধপ্ করে সিটে বসে পড়ে ফেলুদা বলল, 'নতুন জায়গাতে অলিগলিগুলো জানা নেই, তাই বাবাজি রক্ষে পেয়ে গেলেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি লোকটাকে দেখেছিলে?'

'তুই দেখলি, আর আমি দেখব না?'

আমি আর কিছু বললাম না। ফেলুদা লোকটাকে না দেখে থাকলে আমি ওকে বলতাম যে যদিও লোকটার গায়ে কাবলিওয়ালার পোশাক ছিল, কিন্তু অত কম লম্বা কাবলিওয়ালা আমি কখনও দেখিনি।

ফেলুদা এবার পকেট থেকে দলাপাকানো কাগজটা খুলে হাত দিয়ে ঘষে সমান করে, চোখের খুব কাছে নিয়ে তার মধ্যে যে লেখাটা ছিল সেটা পড়ে ফেলল। তারপর সেটাকে তিনভাঁজ করে ওর মানিব্যাগের ভিতর নিয়ে নিল। লেখাটা যে কী ছিল সেটা আর আমার জিজ্ঞেস করার সাহস হল না।

বাড়ি ফিরে দেখি ধীরুকাকার সঙ্গে শ্রীবাস্তব এসেছেন। শ্রীবাস্তবকে দেখে মনে হল না যে আংটিটা যাওয়াতে তাঁর খুব একটা দুঃখ হয়েছে। তিনি বললেন, 'উ আংটি ছিল অপয়া। যার কাছে যাবে তারই দুশ্চিন্তা হোবে, বিপদ হোবে, বাড়িতে ডাকু আসবে। আপনি তো লাকি, ধীরুবাবু। ধরুন যদি ডাকু এসে ঝামেলা করত, গোলাগোলি চালাতো!'

ধীরুকাকা একটু হেসে বললেন, 'তা হলে তবু একটা মানে হত। এ যে একেবারে ভাঁওতা দিয়ে বুদ্ধু বানিয়ে জিনিসটা নিয়ে চলে গেল। এটা যেন কিছুতেই হজম করতে পারছি না।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আপনি কেন ভাবছেন ধীরুবাবু। আংটি আমার কাছে থাকলেও যেত, আপনার কাছে থাকলেও যেত। আর আপনি যে বলেছিলেন পুলিশে খবর দেবেন—তাও করবেন না। ওতে আপনার বিপদ আরও বেড়ে যাবে। যারা চুরি করল, তারা খেপে গিয়ে ফির আপনাদের উপর হামলা করবে।'

ফেলুদা এতক্ষণ একটা সোফায় বসে একটা 'লাইফ' ম্যাগাজিন দেখছিল, এবার সেটাকে বন্ধ করে টেবিলে রেখে দিয়ে হাত দুটোকে সোফার মাথার পিছনে এলিয়ে দিয়ে বলল, 'মহাবীরবাবু জানেন এ আংটির কথা?'

'পিয়ারিলালের ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো আমি জানি না ঠিক। মহাবীর ডুন স্কুলে পড়ত, ওখানেই থাকত। তারপর মিলিটারি একাডেমিতে জয়েন করেছিল। তারপর সেটা ছেড়ে দিল, বোম্বাই গিয়ে ফিল্মে

অ্যাকটিং শুরু করল।'

'উনি ফিল্মে নামার ব্যাপারে পিয়ারিলালের মত ছিল ?'

'সে বিষয়ে আমায় কিছু বলেননি পিয়ারিলাল। তবে জানি উনি ছেলেকে খুব ভালবাসতেন।'

'পিয়ারিলাল মারা যাবার সময় মহাবীর কাছে ছিলেন ?'

'না। বোম্বাই ছিল। খবর পেয়ে এসে গেলো।'

ধীরুকাকা বললেন, 'ফেলুবাবু যে একেবারে পুলিশের মতো জেরা করছ।'

বাবা বললেন, 'ও যে শখের ডিটেক্‌টিভ। ওর ওদিকে বেশ ইয়ে আছে।'

শুনে শ্রীবাস্তব খুব অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাঃ—ভেরি গুড, ভেরি গুড !'

কেবল ধীরুকাকাই যেন একটু ঠাট্টার সুরে বললেন, 'খোদ ডিটেক্‌টিভের বাড়ি থেকেই মালটা চুরি হল, এইটেই যা আপশোস।'

ফেলুদা এ সব কথাবার্তায় কোনও মন্তব্য না করে শ্রীবাস্তবকে আরেকটা প্রশ্ন করল, 'মহাবীরবাবুর ফিল্মে অ্যাকটিং করে ভাল রোজগার হচ্ছে কি ?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'সেটা ঠিক জানি না। মাত্র দুবছর তো হল ?'

'ওঁর এমনিতে টাকার কোনও অভাব আছে ?'

'নাঃ। কারণ, পিয়ারিলাল ওকেই সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। সিনেমাটা ওর শখের ব্যাপার।'

'হুঁ'—বলে ফেলুদা আবার লাইফটা তুলে নিল।

শ্রীবাস্তব হঠাৎ তাঁর রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই দেখুন, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার পেশেন্টের কথাই ভুলে গেছি। আমি চলি !'

শ্রীবাস্তবকে তাঁর গাড়িতে পৌঁছে দিতে বাবা আর ধীরুকাকা বাইরে গেলে পর ফেলুদা ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে একটা বিরাট হাই তুলে বলল, 'তোর চাঁদে যেতে ইচ্ছে করে, না মঙ্গল গ্রহে ?'

আমি বললাম, 'আমার এখন শুধু একটা জিনিসই ইচ্ছে করছে।'

ফেলুদা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল, 'লাইফে চাঁদের সারফেসের ছবি দিয়েছে। দেখে জায়গাটাকে খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে না। মঙ্গল সম্বন্ধে তবু একটা কৌতূহল হয়।'

আমি এবার একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললাম, 'ফেলুদা আমার কৌতূহল হচ্ছে তোমার ম্যানিব্যাগে যে কাগজটা আছে সেইটি দেখার জন্যে।'

'ওঃ—ওইটে !'

'ওটা দেখাবে না বুঝি ?'

'ওটা উর্দুতে লেখা।'

'তবু দেখি না !'

'এই দ্যাখ।'

ফেলুদা ভাঁজ করা কাগজটা বার করে সেটা দু আঙুলের ফাঁকে ধরে ক্যারামের গুটির মতো করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। খুলে দেখি সেটায় লেখা আছে—'খুব হুঁশিয়ার !'

আমি বললাম, 'তবে যে বললে উর্দু ?'

'বোকচন্দর—খুব আর হুঁশিয়ার—এই দুটো কথাই যে উর্দু সেটাও বুঝি তোর জানা নেই ?'

সত্যিই তো! মনে পড়ল একবার বাবা বলেছিলেন—যে-কোনও বাংলা উপন্যাস নিয়ে তার যে-কোনও একটা পাতা খুলে পড়ে দেখো, দেখবে প্রায় অর্ধেক কথা হয় উর্দু, নয় ফারসি, না হয় ইংরেজি—, না হয় পর্তুগিজ, না হয় অন্য কিছু। এ সব কথা বাংলায় এমন চলে গেছে যে, আমরা ভুলে গেছি এগুলো আসলে বাংলা নয়।

আমি লাল অক্ষরে লেখা কথা দুটোর দিকে চেয়ে আছি দেখে প্রায় যেন আমার মনের প্রশ্নটা আন্দাজ করেই ফেলুদা বলল, 'একটা সাজা পানের ডগা দিয়ে অনেক সময় চুন খয়ের মেশানো লাল রস চুঁইয়ে পড়ে দেখেছিস? এটা সেই পানের ডগা দিয়ে লাল রস দিয়ে লেখা।'

আমি লেখাটা নাকের কাছে আনতেই পানের গন্ধ পেলাম।

'কিন্তু কে লিখেছে বলো তো?'

'জানি না।'

'লোকটা বাঙালি তো বটেই?'

'জানি না।'

'কিন্তু তোমাকে কেন লিখতে যাবে? তুমি তো আর আংটি চুরি করোনি।'

ফেলুদা হো হো করে হেসে বলল, 'হুমকি জিনিসটা কি আর চোরকে দেয় রে বোকা? ওটা দেয় চোরের যে শত্রু তাকে। অর্থাৎ ডিটেক্‌টিভকে। তাই এ সব কাজে নামতে হলে ডিটেক্‌টিভের একেবারে প্রাণটি হাতে নিয়ে নামতে হয়।'

আমার বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করে উঠল, আর বুঝতে পারলাম যে গলাটা কেমন জানি শুকিয়ে আসছে। কোনও রকমে ঢোক গিলে বললাম, 'তা হলে এবার থেকে সত্যিই হুঁশিয়ার হওয়া উচিত।'

'হুঁশিয়ার হইনি সে কথা তোকে কে বললে?'—এই বলে ফেলুদা পকেট থেকে একটা গোল কৌটো বার করে আমার নাকের সামনে ধরল। দেখলাম বাক্সটার ঢাকনায় লেখা রয়েছে—'দশংসংস্কারচূর্ণ।'

ওটা যে একটা দাঁতের মাজনের নাম সেটা আমি ছেলেবেলা থেকে জানি—কারণ দাদু ওটা ব্যবহার করতেন। তাই আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'দাঁতের মাজন দিয়ে কী করে হুঁশিয়ার হবে ফেলুদা।'

'তোর যেমন বুদ্ধি!—দাঁতের মাজন হতে যাবে কেন?'

'তবে ওটায় কী আছে?'

চোখ দুটো গোল করে গলাটা বাড়িয়ে আর নামিয়ে নিয়ে ফেলুদা বলল, 'চূর্ণীকৃত ব্রহ্মাস্ত্র!'

৫

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'তোপ্‌সে, কী মনে হচ্ছে বল তো?'

আমি বললাম, 'কীসের কী মনে হচ্ছে?'

'এই যে-সব ঘটনা ঘটছে-টটছে।'

'বারে বা, সে তো তুমি বলবে। আমি আবার কী করে বলব? আমি কি ডিটেকটিভ নাকি? আর সন্ন্যাসীটা কে, সেটা না জানা অবধি তো কিছুই বোঝা যাবে না।'

'কিন্তু কিছু কিছু জিনিস তো বোঝা যাচ্ছে। যেমন, সন্ন্যাসীটা বাথরুমে ঢুকে আর বেরোল না। এটা তো খুব রিভিলিং।'

'রিভিলিং মানে?'

'রিভিলিং মানে যার থেকে অনেক কিছু বোঝা যায়।'

'এখানে কী বোঝা যাচ্ছে?'

'তুই নিজে বুঝতে পারছিস না?'

'আমি বুঝতে পারছি যে ওয়েটিংরুমের দারোয়ানটা অন্যমনস্ক ছিল।'

'তোর মুণ্ডু।'

'তবে?'

'সন্ন্যাসী বেরোলে নিশ্চয়ই দারোয়ানের চোখে পড়ত।'

'তা হলে? সন্ন্যাসী বেরোয়নি?'

'সন্ন্যাসীর হাতে কী ছিল মনে আছে?'

'আমি তো আর...ও হ্যাঁ হ্যাঁ—অ্যাটাচি কেস।'

'সন্ন্যাসীর হাতে অ্যাটাচি কেস দেখেছিস কখনও?'

'তা দেখিনি।'

'সেই তো বলছি। ওটা থেকেই সন্দেহ হয়।'

'কী সন্দেহ হয়?'

'যে সন্ন্যাসী আসলে সন্ন্যাসী নন। উনি প্যান্ট শার্ট কি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা আমাদের মতো অ-সন্ন্যাসী, আর সেই পোশাক ছিল ওই অ্যাটাচি কেসে। গেরুয়াটা ছিল ছদ্মবেশ। খুব সম্ভবত দাড়িগোঁফটাও।'

'বুঝেছি। সেগুলো ও বাক্সে পুরে নিয়েছে, আর অন্য পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছে। তাই দারোয়ান ওকে চিনতে পারেনি।'

'গুড। এইবার মাথা খুলেছে।'

'কিন্তু আজ সকালে তা হলে কে তোমার গায়ে কাগজ ছুঁড়ে মারল?'

'হয় ও নিজেই, না হয় ওর কোনও লোক। স্টেশনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। আমি যে একে-তাকে সন্ন্যাসীর কথা জিজ্ঞেস করছি, সেটা ও শুনেছিল—আর তাই হুমকি দিয়ে গেল।'

'বুঝেছি। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও রহস্য আছে কি?'

'বাবা, বলিস কী! রহস্যের কোনও শেষ আছে নাকি? শ্রীবাস্তবকে স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে কে ফলো করল? সেও কি ওই সন্ন্যাসী, না অন্য কেউ? গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে চারমিনার আর পান খেতে খেতে কে ওয়াচ করছিল? পিয়ারিলাল কোন 'স্পাই'-এর কথা বলতে চেয়েছিলেন? বনবিহারীবাবু হিংস্র জানোয়ার পোষেন কেন? পিয়ারিলালের ছেলে বনবিহারীবাবুকে আগে কোথায় দেখেছে? সে আংটির ব্যাপার কতখানি জানে?'...

* * *

রাত্রে বিছানায় শুয়ে এই সব রহস্যের কথাই ভাবছিলাম। ফেলুদা একটা নীল খাতায় কী যেন সব লিখল। তারপরে সাড়ে দশটায় শুয়ে পড়ল, আর শোবার কিছুক্ষণ পরেই জোরে জোরে নিশ্বাস। বুঝলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

দূর থেকে রামলীলার ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে। একবার একটা জানোয়ারের ডাক শুনলাম—হয়তো শেয়াল কিংবা কুকুর, কিন্তু হঠাৎ কেন জানি হাইনার হাসি বলে মনে হয়েছিল।

বনবিহারীবাবু যে হিংস্র জানোয়ার পোষেন, তাতে ফেলুদার আশ্চর্য হবার কী আছে? সব সময় কি সব জিনিসের পিছনে লুকোনো কারণ থাকে? অনেক রকম অদ্ভুত অদ্ভুত শখের কথা তো শুনতে পাওয়া যায়। বনবিহারীবাবুর চিড়িয়াখানাও হয়তো সেই রকমই একটা

অদ্ভুত শখের নমুনা।

এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, আর কখন যে আবার ঘুমটা ভেঙে গেছে তা জানি না। জাগতেই মনে হল চারিদিক ভীষণ নিস্তব্ধ। ঢাকের বাজনা থেমে গেছে, কুকুর শেয়াল কিচ্ছু ডাকছে না। খালি ফেলুদার জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দ, আর মাথার পিছনে টেবিলের উপর রাখা টাইম পিসটার টিক্ টিক্ শব্দ। আমার চোখটা পায়ের দিকের জানালায় চলে গেল।

জানালা দিয়ে রোজ রাত্রে দেখেছি আকাশ আর আকাশের তারা দেখা যায়। আজ দেখি আকাশের অনেকখানি ঢাকা। একটা অন্ধকার মতো কী যেন জানালার প্রায় সমস্তটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুমের ঘোরটা পুরো কেটে যেতেই বুঝতে পারলাম সেটা একটা মানুষ। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আমাদেরই ঘরের ভিতর দেখছে।

যদিও ভয় করছিল সাংঘাতিক, তবু লোকটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। আকাশে তারা অল্প অল্প থাকলেও ঘরের ভিতর আলো নেই, তাই লোকটার মুখ দেখা অসম্ভব। কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে তার মুখের নীচের দিকটা—মানে নাক থেকে থুতনি অবধি—একটা কালো কাপড়ে ঢাকা!

এবার দেখলাম লোকটা ঘরের ভিতর হাত ঢুকিয়েছে, তবে শুধু হাত নয়, হাতে একটা লম্বা ডান্ডার মতো জিনিস রয়েছে।

একটা মিষ্টি অথচ কড়া গন্ধ এইবার আমার নাকে এল। একে ভয়েতেই প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল, এখন হাত-পাও কী রকম যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল।

আমার মনে যত জোর আছে, সবটা এক সঙ্গে করে, শরীরটা প্রায় একদম না নাড়িয়ে, আমার বাঁ হাতটা আমার পাশেই ঘুমন্ত ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলাম।

আমার চোখ কিন্তু জানালার দিকে। লোকটা এখনও হাতটা বাড়িয়ে রয়েছে, গন্ধটা বেড়ে চলেছে, আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

আমার হাতটা ফেলুদার কোমরে ঠেকল। আমি একটা ঠেলা দিলাম। ফেলুদা একটু নড়ে উঠল। নড়তেই ক্যাঁচ করে খাটের একটা শব্দ হল। আর সেই শব্দটা হতেই জানালার লোকটা হাওয়া!

ফেলুদা ঘুমো ঘুমো গলায় বলল, 'খোঁচা মারছিস কেন?'

আমি শুকনো গলায় কোনওরকমে ঢোক গিলে বললাম, 'জানালায়।'

'কে জানালায়? ঈস্—গন্ধ কীসের?'—বলেই ফেলুদা একলাফে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে ফিরে এসে বলল, 'কী দেখলি ঠিক করে বল তো!'

আমি তখনও প্রায় কাঠের মতো পড়ে আছি। কোনওমতে বললাম, 'একটা লোক...হাতে ডান্ডা...ঘরের ভেতর—'

'হাত বাড়িয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝেছি। লাঠির ডগায় ক্লোরোফর্ম ছিল। আমাদের অজ্ঞান করবার তালে ছিল।'

'কেন?'

'বোধহয় আরেক আংটি-চোর। ভাবছে এখনও আংটি এখানেই আছে। যাক্‌গে—তুই এ ব্যাপারটা আর বাবা কাকাকে বলিস না। মিথ্যে নার্ভাস-টার্ভাস হয়ে আমার কাজটাই ভেস্তে দেবে।'

পরদিন সকালে বাবা আর ধীরুকাকা দুজনেই বললেন যে আর বিশেষ কোনও গোলমাল হবে বলে মনে হচ্ছে না। আংটি উদ্ধারের ভার পুলিশের উপর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইন্‌স্পেক্টর গর্‌গরি কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

পুলিশে আংটি খুঁজে পেলে ফেলুদার উপর টেক্কা দেওয়া হবে, আর তাতে ফেলুদার মনে লাগবে, এই ভেবে আমি মনে মনে প্রার্থনা করলাম পুলিশ যেন কোনওমতেই আংটি খুঁজে না পায়। সে ক্রেডিটটা যেন ফেলুদারই হয়।

বাবা বললেন, 'আজ তোদের আরও কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে আনব ভাবছি।'

ঠিক হল দুপুরে খাওয়ার পর বেরোনো হবে। কোথায় যাওয়া হবে সেটা ঠিক করে দিলেন বনবিহারীবাবু।

আমরা সবে খেয়ে উঠেছি, এমন সময় বনবিহারীবাবু এসে হাজির। বললেন, 'আপনাদের বাড়ি দিনে ডাকাতির খবর পেয়ে চলে এলাম। একটা ভাল দেখে হাউন্ড পুষলে এ-কেলেঙ্কারি হত না। সাধুবাবার উদ্দেশ্য সাধু না অসাধু, সেটা বুঝতে একটা ওয়েল-ট্রেনড জেতো হাউন্ডের লাগত ঠিক পাঁচ সেকেন্ড। যাক চোর পালানোর পর আর বুদ্ধি দিয়ে কী হবে বলুন।'

বনবিহারীবাবু সঙ্গে কাগজে মোড়া পান নিয়ে এসেছিলেন। বললেন, 'লখ্‌নৌ শহরের বেস্ট পান। খেয়ে দেখুন। এক বেনারস ছাড়া কোথাও পাবেন না এ জিনিস।'

আমি মনে মনে ভাবছি, বনবিহারীবাবু যদি বেশিক্ষণ থাকেন তা হলে আমাদের বাইরে যাওয়া ভেস্তে যাবে, এমন সময় উনি নিজেই বললেন, 'বাড়িতে থাকছেন, না বেরোচ্ছেন?'

বাবা বললেন, 'ভেবেছিলাম এদের নিয়ে একটা কিছু দেখিয়ে আনব। ইমামবড়া ছাড়া তো আর কিছুই দেখা হয়নি এখনও।'

'রেসিডেন্স দেখোনি এখনও?' প্রশ্নটা আমাকেই করলেন ভদ্রলোক। আমি মাথা নেড়ে না বললাম।

'চলো—আমার মতো গাইড পাবে না। মিউটিনি সম্বন্ধে আমার থরো নলেজ আছে।'

তারপর ধীরুকাকার দিকে ফিরে বললেন—'আমার কেবল একটা জিনিস জানার কৌতূহল হচ্ছে। আংটিটা কোত্থেকে গেল। সিন্দুকে রেখেছিলেন কি?'

ধীরুকাকা বললেন, 'সিন্দুক আমার নেই। একটা গোদরেজের আলমারি খুলে নিয়ে গেছে। চাবি অবিশ্যি আমার পকেটেই ছিল। বোধহয় ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলেছে।'

'শুনলাম বাক্সটা নাকি রেখে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভেরি স্ট্রেঞ্জ! বাক্স দেরাজে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'দেরাজ ভাল করে খুঁজে দেখেছেন তো?'

'তন্ন তন্ন করে।'

'কিন্তু একটা জিনিস তো করতে পারেন। আলমারির হাতলে, বাক্সটার গায়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে কি না সেটা তো...'

'থাকলে সবচেয়ে বেশি থাকবে আমারই আঙুলের ছাপ। ওতে সুবিধে হবে না।'

বনবিহারীবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'খাসা লোক ছিলেন বাবা পিয়ারিলাল। আংটিটা ইনসিওর পর্যন্ত করেননি। আর যাঁকে দিয়ে গেলেন তিনিও অবিশ্যি তথৈবচ। যাক—হাড়ের ডাক্তারের এবার হাড়ে হাড়ে শিক্ষা হয়েছে।'

এবার আর আমাদের টাঙ্গায় যাওয়া হল না। বনবিহারীবাবুর গাড়িতেই সবাই উঠে পড়লাম। ফেলুদা আর আমি সামনে ড্রাইভারের পাশে বসলাম।

ক্লাইভ রোড দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন বনবিহারীবাবু আমাদের দুজনকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা এখানে এসে এমন একটা রহস্যের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে ভেবেছিলে কি ?'

আমি মাথা নেড়ে না বললাম। ফেলুদা খালি হিঃ হিঃ করে একটু হাসল।

বাবা বললেন, 'ফেলুবাবুর অবিশ্যি পোয়া বারো, কারণ ওর এ সব ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট। ও হল যাকে বলে শখের ডিটেকটিভ।'

'বটে ?'

বনবিহারীবাবু যেন খবরটা শুনে খুবই অবাক আর খুশি হলেন। বললেন, 'ব্রেনের ব্যায়ামের পক্ষে ওটা খুব ভাল জিনিস। তা, রহস্যের কিছু কিনারা করতে পারলে ফেলুবাবু ?'

ফেলুদা বলল, 'এ তো সবে শুরু।'

'অবিশ্যি তুমি কোন রহস্যের কথা ভাবছ জানি না। আমার কাছে অনেক কিছুই রহস্যজনক।'

ধীরুকাকা বললেন, 'কী রকম ?'

'এই যেমন ধরুন—সন্ন্যাসী গোদরেজের আলমারির চাবি পেল কোত্থেকে। তারপর বাড়িতে চাকর-বাকর থাকতে সে-সন্ন্যাসীর এত সাহসই বা হবে কোত্থেকে যে সে একেবারে আপনার বেডরুমে গিয়ে ঢুকবে। তা ছাড়া একটা ব্যাপার তো অনেকদিন থেকেই খটকা লেগে আছে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'কী ব্যাপার ?'

'শ্রীবাস্তবকে সত্যিই পিয়ারিলাল আংটি দিয়েছিলেন, না শ্রীবাস্তব সেটা অন্য ভাবে—'

ধীরুকাকা বাধা দিয়ে বললেন, 'সে কী মশাই, আপনি কি শ্রীবাস্তবকেও সন্দেহ করেন নাকি ?'

'সন্দেহ তো প্রত্যেককেই করতে হবে—এমন কী আমাকে আপনাকেও—তাই নয় কি ফেলুবাবু ?'

ফেলুদা বলল, 'নিশ্চয়ই। আর যেদিন সন্ন্যাসী আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, সেদিন তো শ্রীবাস্তবও এসেছিলেন—ওই বিকেলেই। তারপর আমাদের না পেয়ে বনবিহারীবাবুর বাড়িতে এলেন।'

'এগ্‌জ্যাক্টলি !' বনবিহারীবাবু যেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

এবারে বাবা যেন বেশ থতমত খেয়েই বললেন, 'কিন্তু শ্রীবাস্তব যদি অসদুপায়ে আংটি পেয়ে থাকেন, তা হলে তিনি সেটা আমাদের কাছে রাখবেনই বা কেন, আর রেখে সেটা চুরিই বা করবেন কেন ?'

বনবিহারীবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'বুঝলেন না ? অত্যন্ত সহজ। শ্রীবাস্তবের পেছনে সত্যিই ডাকাত লেগেছিল। ভিতু মানুষ—তাই ভয় পেয়ে আংটিটা আপনাদের কাছে এনে রেখেছিলেন। এদিকে লোভও আছে ষোলো আনা, তাই তিনি নিজেই আবার সেটা চুরি করে চোরদের ধাপ্পা দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন।'

আমার মাথার মধ্যে সব কেমন জানি গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল। শ্রীবাস্তবের মতো এত ভালমানুষ হাসিখুশি লোক, তিনি কখনও চোর হতে পারেন ? ফেলুদাও কি বনবিহারীবাবুর সঙ্গে একমত, নাকি বনবিহারীবাবুর কথাতেই ওর প্রথম শ্রীবাস্তবের ওপর সন্দেহ পড়েছে ?

বনবিহারীবাবু বললেন, 'শ্রীবাস্তব অমায়িক লোক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন—লখ্‌নৌ-এর মতো জায়গা—এমন আর কী—সেখানে স্রেফ হাড়ের ব্যারামের চিকিৎসা করে এত বড় বাড়ি গাড়ি বাগান আসবাবপত্র—ভাবতে একটু ইয়ে লাগে না কি?'

ধীরুকাকা বললেন, 'ওর বাপের হয়তো টাকা ছিল?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'বাপ ছিলেন এলাহাবাদ পোস্ট আপিসের সামান্য কেরানি।'

এই সময় ফেলুদা হঠাৎ একটা বাজে প্রশ্ন করে বসল—

'আপনার কোনও জানোয়ার কখনও আপনাকে কামড়েছে কি?'

'নো নেভার।'

'তা হলে আপনার ডান হাতের কবজিতে ওই দাগটা কী?'

'ও হো হো—বাঃ বাঃ, তুমি তো খুব ভাল লক্ষ করেছ—কারণ ও দাগটা সচরাচর আমার আস্তিনের ভেতরেই থাকে। ওটা হয়েছিল ফেন্‌সিং করতে গিয়ে। ফেন্‌সিং বোঝো?'

ফেলুদা কেন—আমিও জানতাম ফেন্‌সিং কাকে বলে। রেপিয়ার বলে একরকম সরু লম্বা তলোয়ার দিয়ে খেলাকে বলে ফেন্‌সিং।

'ফেন্‌সিং করতে গিয়ে হাতে খোঁচা খাই। এটা সেই খোঁচার দাগ।'

রেসিডেন্সিটা সত্যিই একটা দেখবার জিনিস। প্রথমত জায়গাটা খুব সুন্দর। চারিদিকে বড় বড় গাছপালা—তার মাঝখানে এখানে ওখানে এক একটা মিউটিনির আমলের সাহেবদের ভাঙা বাড়ি। গাছগুলোর ডালে দেখলাম ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁদর। লখ্‌নৌ শহরের বাঁদরের কথা আগেই শুনেছি, এবার নিজের চোখে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখলাম।

কতগুলো রাস্তার ছেলে গুলতি দিয়ে বাঁদরগুলোর দিকে তাগ করে ইঁট মারছিল—বনবিহারীবাবু তাদের কষে ধমক দিলেন। তারপর আমাদের বললেন, 'জন্তুজানোয়ারের ওপর দুর্ব্যবহারটা আমি সহ্য করতে পারি না। আমাদের দেশেই এ-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।'

ইতিহাসে সিপাহি বিদ্রোহের কথা পড়েছি, রেসিডেন্সি দেখার সময় সেই বইয়ে পড়া ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল।

একটা বড় বাড়ির ভিতর আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি, আর বনবিহারীবাবু বর্ণনা দিয়ে চলেছে—

'সেপাই মিউটিনির সময় লখ্‌নৌ শহরে নবাবদেরই রাজত্ব। ব্রিটিশরা তাদের সৈন্য রেখেছিলেন এই বাড়িটার ভেতরেই। স্যার হেনরি লরেন্স ছিলেন তাদের সেনাপতি। বিদ্রোহ লাগল দেখে প্রাণের ভয়ে লখ্‌নৌ শহরের যত সাহেব মেমসাহেব একটা হাসপাতালের ভিতর গিয়ে আশ্রয় নিল। কদিন খুব লড়েছিলেন স্যার হেনরি, কিন্তু আর শেষটায় পেরে উঠলেন না। সেপাই-এর গুলিতে তাঁর মৃত্যু হল। আর তার পরে ব্রিটিশদের কী দশা হল সেটা এই বাড়ির চেহারা দেখেই কিছুটা আন্দাজ করতে পারছ। স্যার কলিন ক্যাম্পবেল যদি শেষটায় টাটকা সৈন্য সামন্ত নিয়ে না-এসে পড়তেন, তা হলে ব্রিটিশদের দফা রফা হয়ে যেত।...এ ঘরটা ছিল বিলিয়ার্ড খেলার ঘর। দেয়ালে সেপাইদের গোলা লেগে কী অবস্থা হয়েছে দেখো।'

বাবা আর ধীরুকাকা আগেই রেসিডেন্সি দেখেছেন বলে মাঠে পায়চারি করছিলেন। আমি আর ফেলুদাই তন্ময় হয়ে বনবিহারীবাবুর কথা শুনছিলাম। আর দুশো বছরের পুরনো পাতলা অথচ মজবুত ইটের তৈরি ব্রিটিশদের ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখছিলাম, এমন সময় ঘরের দেয়ালের একটা ফুটো দিয়ে হঠাৎ কী একটা জিনিস তীরের মতো এসে ফেলুদার কান

ঘেঁষে ধাঁই করে পিছনের দেয়ালে লেগে মাটিতে পড়ল। চেয়ে দেখি সেটা একটা পাথরের টুকরো।

তার পরমুহূর্তেই বনবিহারীবাবু একটা হ্যাঁচকা টানে ফেলুদাকে তার দিকে টেনে নিলেন, আর ঠিক সেই সময় আরেকটা পাথর এসে আবার ঘরের দেয়ালে লেগে মাটিতে পড়ল। পাথরগুলো যে গুলতি দিয়ে মারা হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বনবিহারীবাবুর বয়স হলেও এখনও যে কত চটপটে সেটা এবার বেশ বুঝতে পারলাম। উনি এক লাফে দেয়ালের একটা বড় গর্তের ভেতর দিয়ে গিয়ে বাইরের ঘাসে পড়লেন। আমি আর ফেলুদাও অবিশ্যি তক্ষুনি লাফিয়ে গিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছলাম। আর গিয়েই দেখলাম যে-দিক দিয়ে পাথর এসেছে, সেই দিকে বেশ খানিক দূরে, একটা লাল ফেজটুপি আর কালো কোট পরা দাড়িওয়ালা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে।

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সোজা লোকটার দিকে ছুটল। আমি ফেলুদার পিছনে পিছনে যাব বলে পা বাড়িয়েছিলাম, কিন্তু বনবিহারীবাবু আমার জামার আস্তিনটা ধরে বললেন, 'তুমি এখনও স্কুলবয় তপেশ ; তোমার এ সব গোলমালের মধ্যে না যাওয়াই ভাল।'

কিছুক্ষণ পরে ফেলুদা ফিরে এল। বনবিহারীবাবু বললেন, 'ধরতে পারলে ?'

ফেলুদা বলল, 'নাঃ। অনেকটা ডিস্‌ট্যান্স। একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে উঠে ভেগেছে লোকটা।'

বনবিহারীবাবু চাপা গলায় বললেন, 'স্কাউন্ড্রেল !' তারপর আমাদের দুজনের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'চলো—আর এখানে থাকা ঠিক হবে না।'

একটু এগিয়ে গিয়ে বাবা আর ধীরুকাকার সঙ্গে দেখা হল। বাবা বললেন, 'ফেলু এত হাঁপাচ্ছ কেন ?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ওর বোধহয় গোয়েন্দাগিরিটা বেশি না করাই ভাল। মনে হচ্ছে

ওর পেছনে গুণ্ডা লেগেছে।'

বাবা আর ধীরুকাকা দুজনেই ঘটনাটা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলেন।

তখন বনবিহারীবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'চিন্তা করবেন না। আমি রসিকতা করছিলাম। আসলে পাথরগুলো আমাকেই লক্ষ্য করে মারা হয়েছিল। ওই যে ছোকরাগুলোকে তখন ধমক দিলুম এ হচ্ছে তারই প্রতিশোধ।'

তারপর ফেলুদার দিকে ঘুরে বললেন, 'তবে তাও বলছি ফেলুবাবু, তোমারও বয়সটা কাঁচাই। বিদেশ-বিভুঁয়ে একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়বে সেটা কি খুব ভাল হবে? এবার থেকে একটু খেয়াল করে চলো।'

কথাটা শুনে ফেলুদা চুপ করে রইল।

গাড়ির দিকে হাঁটার সময় দুজনে একটু পেছিয়ে পড়েছিলাম—সেই সুযোগে ফেলুদাকে ফিস ফিস করে বললাম, 'পাথরটা তোমাকে মারছিল, না ওঁকে?'

ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ওঁকে মারলে কি উনি চুপ করে থাকতেন নাকি? হুল্লাটিল্লা করে রেসিডেন্সির বাকি ইঁট কটা খসিয়ে দিতেন না?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তবে একটা জিনিস পেয়েছি। লোকটা পালানোর সময় ফেলে গিয়েছিল।'

'কী জিনিস?'

ফেলুদা পকেট থেকে একটা কালো জিনিস বার করে দেখাল। ভাল করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা নকল গোঁফ, আর তাতে এখনও শুকনো আঠা লেগে রয়েছে।

গোঁফটা আবার পকেটে রেখে ফেলুদা বলল, 'পাথরগুলো যে আমাকেই মারা হয়েছে, সেটা ভদ্রলোক খুব ভাল ভাবেই জানেন।'

'তা হলে বললেন না কেন?'

'হয় আমাদের নার্ভাস করতে চান না, আর না হয়...'

'না হয় কী?'

ফেলুদা উত্তরের বদলে মাথা ঝাঁকিয়ে একটা তুড়ি মেরে বলল, 'কেসটা জমে আসছে রে তোপসে। তুই এখন থেকে আর আমাকে একদম ডিস্টার্ব করবি না।'

বাকি দিনটা ও আর একটাও কথা বলেনি আমার সঙ্গে। বেশির ভাগ সময় বাগানে পায়চারি করেছে, আর বাকি সময়টা ওর নীল নোটবইটাতে হিজিবিজি কী সব লিখেছে। ও যখন বাগানে ঘুরছিল, তখন আমি একবার লুকিয়ে লুকিয়ে বইটা খুলে দেখেছিলাম, কিন্তু একটা অক্ষরও পড়তে পারিনি, কারণ সেরকম অক্ষর এর আগে আমি কখনও দেখিনি।

৬

টাঙ্গায় উঠে ফেলুদা গাড়োয়ানকে বলল, 'হজরতগঞ্জ।'

আমি বললাম, 'সেটা আবার কোন জায়গা?'

'এখানকার চৌরঙ্গি। শুধু নবাবি আমলের জিনিস ছাড়াও তো শহরে দেখবার জিনিস আছে। আজ একটু দোকান-টোকান ঘুরে দেখব।'

গতকাল রেসিডেন্সি থেকে আমরা বনবিহারীবাবুর বাড়িতে কফি খেতে গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে ওঁর চিড়িয়াখানাটাও আরেকবার দেখে নিয়েছিলাম। সেই হাইনা, সেই র‍্যাট্‌ল্‌ স্নেক, সেই মাকড়সা, সেই বনবেড়াল, সেই কাঁকড়া বিছে।

বৈঠকখানায় বসে কফি খেতে খেতে ফেলুদা একটা দরজার দিকে দেখিয়ে বলল, 'ও

দরজাটায় সেদিনও তালা দেখলাম, আজও তালা।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'হ্যাঁ—ওটা একটা এক্স্ট্রা ঘর। এসে অবধি তালা লাগিয়ে রেখেছি। খোলা রাখলেই ঝাড়পোঁছের হ্যাঙ্গামা এসে যায়, বুঝলে না।'

ফেলুদা বলল, 'তা হলে তালাটা নিশ্চয়ই বদল করা হয়েছে, কারণ এটায় তো মরচে ধরেনি।'

বনবিহারীবাবু ফেলুদার দিকে একটু হাসি-হাসি অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—এর আগেরটায় এত বেশি মরচে ধরেছিল যে ওটা বদলাতে বাধ্য হলাম।'

বাবা বললেন, 'আমরা ভাবছিলাম হরিদ্বার লছমনঝুলাটা এই ফাঁকে সেরে আসব।'

বনবিহারীবাবু পাইপ ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে কড়া গন্ধওয়ালা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কবে যাবেন? পরশু যদি যান তো আমিও আসতে পারি আপনাদের সঙ্গে। আমার এমনিতেই সেই বারো ফুট অজগর সাপটা দেখার জন্য একবার যাওয়া দরকার। আর ফেলুবাবুও যেভাবে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছেন, কয়েকদিনের জন্য শহর ছেড়ে কোথাও যেতে পারলে বোধহয় সকলেরই মঙ্গল।'

ধীরুকাকা বললেন, 'আমার তো শহর ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। তোমরা কজন ঘুরে এসো না। ফেলু তপেশ দুজনেরই লছমনঝুলা না-দেখে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আমার সঙ্গে গেলে আপনাদের একটা সুবিধে হবে—আমার চেনা ধরমশালা আছে, এমন কী হরিদ্বার থেকে লছমনঝুলা যাবার গাড়ির ব্যবস্থাও আমি চেনাশুনার মধ্যে থেকে করে দিতে পারব। এখন আপনারা ব্যাপারটা ডিসাইড করুন।'

ঠিক হল পরশু শুক্রবারই আমরা রওনা দেব। দুদিন আগে যদি বনবিহারীবাবু বলতেন আমাদের সঙ্গে যাবেন, তা হলে আমার খুব ভালই লাগত। কিন্তু আজ বিকেলে রেসিডেন্সির ঘটনার পর থেকে আমার লোকটা সম্বন্ধে মনে একটা কীরকম খটকা লেগে গেছে। তবুও যখন দেখলাম ফেলুদার খুব একটা আপত্তি নেই, তখন আমিও মনটাকে যাবার জন্য তৈরি করে নিলাম।

আজ সকালে উঠে ফেলুদা বলল, 'দাড়ি কামাবার ব্লেড ফুরিয়ে গেছে—ওখানে গিয়ে মুশকিলে পড়ে যাব। চল ব্লেড কিনে আনিগে।'

তাই দুজনে টাঙ্গা করে বেরিয়েছি। হজরতগঞ্জে নাকি সব কিছুই পাওয়া যায়।

কাল থেকেই দেখছি ফেলুদা আংটি নিয়ে আর কিছুই বলছে না। আজ সকালে ও যখন স্নান করতে গিয়েছিল, তখন আমি আরেকবার ওর নোটবইটা খুলে, দেখেছিলাম, কিন্তু পড়তে পারিনি। অক্ষরগুলোর এক একটা ইংরিজি মনে হয়, কিন্তু বেশির ভাগই অচেনা।

গাড়িতে যেতে যেতে আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

ও প্রথমে লুকিয়ে ওর খাতা দেখার জন্য দারুণ রেগে গেল। বলল, 'এটা তুই একটা জঘন্য কাজ করেছিস। তোকে প্রায় ক্রিমিন্যাল বলা যেতে পারে।'

তারপর একটু নরম হয়ে বলল, 'তোর পক্ষে ওটা পড়ার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ ও অক্ষর তোর জানা নেই।'

'কী অক্ষর ওটা?'

'গ্রিক।'

'ভাষাটাও গ্রিক?'

'না।'

'তবে?'

'ইংরিজি।'

'তা তুমি গ্রিক অক্ষর শিখলে কী করে?'

'সে অনেকদিনের শেখা। ফার্স্ট-ইয়ারে থাকতে। আল্ফা বিটা গামা ডেল্টা পাই মিউ এপসাইলন—এ সব তো অঙ্কতেই শিখেছি, আর বাকিগুলো শিখে নিয়েছিলাম এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকা থেকে। ইংরিজি ভাষাটা গ্রিক অক্ষরে লিখলে বেশ একটা সাংকেতিক ভাষা হয়ে যায়। এমনি লোকের কারুর সাধ্য নেই যে পড়ে।'

'লখ্নৌ বানান কী হবে গ্রিকে?'

'ল্যামডা উপসাইলন কাপা নিউ ওমিক্রন উপসাইলন! C আর Wটা গ্রিকে নেই, তাই বানানটা হচ্ছে L-U K-N O U।'

'আর ক্যালকাটা বানান?'

'কাপা আল্ফা ল্যাম্ডা কাপা উপসাইলন টাউ টাউ আল্ফা'।

'বাস্‌রে বাস্! তিনটে বানান করতেই পিরিয়ড কাবার!'

চৌরঙ্গি বললে অবিশ্যি বাড়িয়ে বলা হবে—কিন্তু হজরতগঞ্জের দোকান-টোকানগুলো বেশ ভালই দেখতে।

টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ফেলুদা আর আমি হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

'ওই তো মনিহারি দোকান ফেলুদা—ওখানে নিশ্চয়ই ব্রেড পাওয়া যাবে।'

'দাঁড়া, আগে একটা অন্য কাজ সেরে নিই।'

আরও কিছুদূর গিয়ে ফেলুদা হঠাৎ একটা দোকান দেখে সেটার দিকে এগিয়ে গেল। দোকানের সামনে লাল সাইনবোর্ডে সোনালি উঁচু উঁচু অক্ষরে লেখা আছে—

MALKANI & CO

ANTIQUE & CURIO DEALERS

কাচের মধ্যে দিয়ে দোকানের ভিতরটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম সেটা সব পুরনো আমলের জিনিসের দোকান। ঢুকে দেখি হরেক রকমের পুরনো জিনিসে দোকানটা গিজগিজ করছে—গয়নাগাটি কার্পেট ঘড়ি চেয়ার টেবিল ঝাড়লণ্ঠন বাঁধানো ছবি আর আরও কত কী।

পাকাচুলওয়ালা সোনার চশমা পরা একজন বুড়ো ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

ফেলুদা বলল, 'বাদশাদের আমলের গয়নাগাটি কিছু আছে আপনাদের এখানে?'

'গয়না তো নেই। তবে মুগল আমলের ঢাল তলোয়ার জাজিম বর্ম, এই সব কিছু আছে। দেখাব?'

ফেলুদা একটা কাচের আতরদান হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'পিয়ারিলালের কাছে কিছু মুগল আমলের গয়না দেখেছিলাম। তিনি তো আপনার খুব বড় খদ্দের ছিলেন, তাই না?'

ভদ্রলোক যেন অবাক হলেন।

'বড় খদ্দের? কোন পিয়ারিলাল?'

'কেন—পিয়ারিলাল শেঠ, যিনি কিছুদিন আগে মারা গেলেন।'

মালকানি মাথা নেড়ে বললেন, 'আমার কাছ থেকে কখনই কিছু কেনেননি তিনি, আর আমার চেয়ে বড় দোকান এখানে আর নেই।'

'আই সি। তা হলে বোধহয় যখন কলকাতায় ছিলেন তখন কিনেছিলেন।'

'তাই হবে।'

'এখানে বড় খদ্দের বলতে কাকে বলেন আপনি?'

মালকানির মুখ দেখে বুঝলাম বড় খদ্দের তার খুব বেশি নেই। বললেন, 'বিদেশি টুরিস্ট এসে মাঝে মাঝে ভাল জিনিস ভাল দামে কিনে নিয়ে যায়। এখানের খদ্দের বলতে মিস্টার মেহতা আছেন, মাঝে মাঝে এটা সেটা নেন, আর মিস্টার পেস্টনজি আমার অনেক দিনের খদ্দের—সেদিন তিন হাজার টাকায় একটা কার্পেট কিনে নিয়ে গেছেন—খাস ইরানের জিনিস।'

ফেলুদা হঠাৎ একটা হাতির দাঁতের তৈরি নৌকোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওটা বাংলা দেশের জিনিস না ?'

'হ্যাঁ, মুরশিদাবাদ।'

'দেখেছিস তোপ্‌সে—বজরাটা কেমন বানিয়েছে।'

সত্যি, এত সুন্দর হাতির দাঁতের কাজ করা নৌকো আমি কখনও দেখিনি। বজরার ছাতে সামিয়ানার তলায় নবাব বসে গড়গড়া টানছে, তার দুপাশে পাত্রমিত্র সভাসদ সব বসে আছে, আর সামনে নাচগান হচ্ছে। ষোলোজন দাঁড়ি দাঁড় বাইছে, আর একটা লোক হাল ধরে বসে আছে। তা ছাড়া সেপাই বরকন্দাজ সব কিছুই আছে, আর সব কিছুই এত নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে দেখলে তাক লেগে যায়।

ফেলুদা বলল, 'এটা কোত্থেকে পেলেন ?'

'ওটা বেচলেন মিস্টার সরকার।'

'কোন মিস্টার সরকার ?'

'মিস্টার বি. সরকার—যিনি বাদশানগরে থাকেন। উনি মাঝে মাঝে এটা সেটা কিনে নিয়ে যান। ভাল জিনিস আছে ওঁর কাছে।'

'আই সি। ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার দোকান ভারী ভাল লাগল। গুড ডে।'

'গুড ডে, স্যার।'

বাইরে এসে ফেলুদা বলল, 'বনবিহারী সরকারের তা হলে এ সব দোকানে যাতায়াত আছে। অবিশ্যি সে সন্দেহটা আমার আগেই হয়েছিল।'

'কিন্তু উনি যে বলেছিলেন এ সব ব্যাপারে ওঁর কোনও ইন্টারেস্ট নেই।'

'ইন্টারেস্ট না থাকলে পাথর দেখেই কেউ বলতে পারে সেটা আসল কি নকল ?'

মালকানি ব্রাদার্সের সামনে দেখি এম্পায়ার বুক স্টল বলে একটা বইয়ের দোকান। ফেলুদা বলল ওর হরিদ্বার লছমনঝুলা সম্বন্ধে একটা বই কেনা দরকার, তাই আমরা দোকানটায় ঢুকলাম, আর ঢুকেই দেখি পিয়ারিলালের ছেলে মহাবীর।

ফেলুদা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ক্রিকেটের বই কিনছে। ভেরি গুড।'

মহাবীর আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে বই কিনছিল তাই আমাদের দেখতে পায়নি।

ফেলুদা দোকানদারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নেভিল কার্ডাসের কোনও বই আছে আপনাদের ?'

বলতেই মহাবীর ফেলুদার দিকে ফিরে তাকাল। আমি জানতাম নেভিল কার্ডাস ক্রিকেট সম্বন্ধে খুব ভাল ভাল বই লিখেছে।

দোকানদার বলল, 'কোন বইটা খুঁজছেন বলুন তো ?'

'Centuries বইটা আছে ?'

'আজ্ঞে না—তবে অন্য বই দেখাতে পারি।'

মহাবীর মুখে হাসি নিয়ে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার বুঝি ক্রিকেটে ইন্টারেস্ট ?'

'হ্যাঁ। আপনারও দেখছি...'

মহাবীর তার হাতের বইটা ফেলুদাকে দেখিয়ে বলল, 'এটা আমার অর্ডার দেওয়া ছিল। ব্র্যাডম্যানের আত্মজীবনী।'

'ওহো—ওটা পড়েছি। দারুণ বই।'

'আপনার কী মনে হয়—রণজি বড় ছিলেন, না ব্র্যাডম্যান?'

দুজনে ক্রিকেটের গল্পে দারুণ মেতে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলার পর মহাবীর বলল, 'কাছেই কোয়ালিটি আছে, আসুন না একটু বসে চা খাই।'

ফেলুদা আপত্তি করল না। আমরা তিনজনে গিয়ে কোয়ালিটিতে ঢুকলাম। ওরা দুজনে চা আর আমি কোকা-কোলা অর্ডার দিলাম। মহাবীর বলল, 'আপনি নিজে ক্রিকেট খেলেন?'

ফেলুদা বলল, 'খেলতাম। স্লো স্পিন বল দিতাম। লখ্‌নৌয়ে ক্রিকেট খেলে গেছি। ...আর আপনি!'

'আমি ডুন স্কুলে ফার্স্ট ইলেভেনে খেলেছি। বাবাও স্কুলে থাকতে ভাল খেলতেন।'

পিয়ারিলালের কথা বলেই মহাবীর কেমন জানি গম্ভীর হয়ে গেল।

ফেলুদা চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'আপনি আংটির ঘটনাটা জানেন নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ। ডক্টর শ্রীবাস্তবের বাড়ি গিয়েছিলাম। উনি বললেন।'

'আপনার বাবার যে আংটি ছিল, আর উনি যে সেটা শ্রীবাস্তবকে দিয়েছিলেন সেটা আপনি জানতেন তো?'

'বাবা আমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে আমাকে ভাল করে দেবার জন্য শ্রীবাস্তবকে উনি একটা কিছু দিতে চান। সেটা যে কী, সেটা অবিশ্যি আমি বাবা মারা যাবার পর শ্রীবাস্তবের কাছেই জেনেছি।'

তারপর হঠাৎ ফেলুদার দিকে তাকিয়ে মহাবীর বলল, 'কিন্তু আপনি এ ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট নিয়েছেন কেন?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'ওটা আমার একটা শখের ব্যাপার।'

মহাবীর চায়ে চুমুক দিয়ে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

ফেলুদা বলল, 'আপনার বাড়িতে আর কে থাকেন?'

'আমার এক বুড়ি পিসিমা আছেন, আর চাকর-বাকর।'

'চাকর-বাকর কি পুরনো?'

'সবাই আমার জন্মের আগে থেকে আছে। অর্থাৎ কলকাতায় থাকার সময় থেকে প্রীতম সিং বেয়ারা আছে আজ পঁয়ত্রিশ বছর।'

'আংটিটার মতো আর কোনও জিনিস আপনার বাবার কাছে ছিল?'

'বাবার এ-শখটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এটা অনেক দিন আগের ব্যাপার। তখন আমি খুবই ছোট। এবার এসে এই সেদিন বাবার একটা সিন্দুক খুলেছিলাম, তাতে বাদশাহী আমলের আরও কিছু জিনিস পেয়েছি। তবে আংটিটার মতো অত দামি বোধহয় আর কোনওটা নয়।'

আমি 'স্ট্র' দিয়ে আমার ঠাণ্ডা কোকা-কোলায় চুমুক দিলাম। মহাবীর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গলাটা একটু নামিয়ে নিয়ে বলল, 'প্রীতম সিং একটা অদ্ভুত কথা বলেছে আমাকে।'

ফেলুদা চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। রেস্টুরেন্টের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে মহাবীর বলল, 'বাবার যেদিন দ্বিতীয় বার হার্ট অ্যাটাক হল, সেদিন সকালে অ্যাটাকটা হবার কিছু আগেই প্রীতম সিং বাবার ঘর থেকে বাবারই গলায় একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল।'

'বটে?'

'কিন্তু প্রীতম সিং তখন খুব বিচলিত হয়নি, কারণ বাবার মাঝে মাঝে কোমরে একটা ব্যথা হত, তখন চেয়ার বা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় উনি একটা আর্তনাদ করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কারুর সাহায্য নিতেন না। প্রীতম সিং প্রথমে ভেবেছিল ব্যথার জন্যই উনি চিৎকার করছেন, কিন্তু এখন বলে যে ওর হয়তো ভুল হতে পারে, কারণ চিৎকারটা ছিল বেশ জোরে।'

'আচ্ছা, সেদিন আপনার বাবার সঙ্গে কেউ দেখা করতে গিয়েছিলেন কি না সে খবর আপনি জানেন ? প্রীতম সিং-এর কিছু মনে আছে কি ?'

'সে কথা আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু ও ডেফিনিটলি কিছু বলতে পারছে না। সকালের দিকটায় মাঝে মাঝে বাবার কাছে লোকজন আসত—কিন্তু বিশেষ করে সেদিন ওঁর কাছে কেউ এসেছিল কি না সে কথা প্রীতম বলতে পারছে না। প্রীতম যখন বাবার ঘরে গিয়েছিল, তখন ওঁর অবস্থা খুবই খারাপ, আর তখন ঘরে অন্য কোনও লোক ছিল না। তারপর প্রীতমই ফোন করে শ্রীবাস্তবকে আনায়। বাবার হার্টের চিকিৎসা যিনি করতেন—ডক্টর গ্রেহ্যাম—তিনি সেদিন এলাহাবাদে ছিলেন একটা কন্‌ফারেন্সে।'

'আর স্পাই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা ?'

'স্পাই ?'—মহাবীর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'ও, তা হলে আপনি এটা জানেন না। আপনার বাবা শ্রীবাস্তবকে 'স্পাই' সম্বন্ধে কী যেন বলতে গিয়ে কথাটা শেষ করতে পারেননি।'

মহাবীর মাথা নেড়ে বলল, 'এটা আমার কাছে একেবারে নতুন জিনিস। এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, আর বাবার সঙ্গে গুপ্তচরের কী সম্পর্ক থেকে থাকতে পারে তা আমি কল্পনাই করতে পারছি না।'

আমি কোকো-কোলাটাকে শেষ করে সবে স্ট্র-টাকে দুমড়ে দিয়েছি, এমন সময় দেখলাম একজন ষণ্ডা মার্কা লোক আমাদের কাছেই একটা টেবিলে বসে চা খেতে খেতে আমাদেরই দিকে দেখছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক টেবিল ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলেন, আর ফেলুদার দিকে ঘাড়টা কাত করে বললেন, 'নমস্কার। চিনতে পারছেন ?'

'হ্যাঁ—কেন পারব না।'

আমি প্রথমে চিনতে পারিনি, এখন হঠাৎ ধাঁ করে মনে পড়ে গেল—ইনিই বনবিহারীবাবুর বাড়িতে থাকেন আর ওঁর চিড়িয়াখানা দেখাশোনা করেন। ভদ্রলোকের থুতনিতে একটা তুলোর উপর দুটো স্টিকিং প্লাস্টার ক্রসের মতো করে লাগানো রয়েছে। বোধহয় দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে গেছে।

ফেলুদা বলল, 'বসুন। ইনি হচ্ছেন মহাবীর শেঠ—আর ইনি গণেশ গুহ।'

এবার লক্ষ করলাম যে ভদ্রলোকের ঘাড়েও একটা আঁচড়ের দাগ রয়েছে—যদিও এ দাগটা পুরনো।

ফেলুদা বলল, 'আপনার থুতনিতে কী হল ?'

গণেশবাবু তার নিজের টেবিল থেকে চায়ের পেয়ালাটা তুলে এনে আমাদের টেবিলে রেখে বলল, 'আর বলবেন না—সমস্ত শরীরটাই যে আদ্দিন ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ হয়ে যায়নি সেই ভাগ্যি। আমার চাকরিটা কী সে তো জানেনই।'

'জানি। তবে আমার ধারণা ছিল চাকরিটা খুশি হয়েই করেন আপনি।'

'পাগল ! সব পেটের দায়ে। এক কালে বিজু সার্কাসের বাঘের ইন-চার্জ ছিলুম—তা সে বাঘ তো আফিম খেয়ে গুম হয়ে পড়ে থাকত। বনবিহারীবাবুর এই সব জানোয়ারের কাছে তো সে দুগ্ধপোষ্য শিশু। সেদিন বেড়ালের আঁচড়, আর কাল এই থুতনিতে হাইনার চাপড় !

আর পারলুম না। সকালে গিয়ে বলে এসেছি—আমার মাইনে চুকিয়ে দিন। আমি ফিরে যাচ্ছি সার্কাস পার্টিতে। তা ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন।'

ফেলুদা যেন খবরটা শুনে অবাক হয়ে গেল। বলল, 'সেকী, আপনি বনবিহারীবাবুর চাকরি ছেড়ে দিলেন ? কাল বিকেলেও তো আমরা ওঁর ওখানে ঘুরে এলাম।'

'জানি। শুধু আপনারা কেন, অনেকেই যাবেন। কিন্তু আমি আর ও তল্লাটেই নয়। এই এখন স্টেশনে যাব, গিয়ে হাওড়ার টিকিট কাটব। ব্যস্—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত। আর—' ভদ্রলোক নিচু হয়ে ফেলুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন, '—একটা কথা বলে যাই—উনি লোকটি খুব সুবিধের নন।'

'বনবিহারীবাবু ?'

'আগে ঠিকই ছিলেন, ইদানীং হাতে একটি জিনিস পেয়ে মাথাটি গেছে বিগড়ে।'

'কী জিনিস ?'

'সে আর না হয় নাই বললাম'—বলে গণেশ গুহ তার চায়ের পয়সা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে হাওয়া হয়ে গেল।

ফেলুদা এবার মহাবীরের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি দেখেছেন বনবিহারীবাবুর চিড়িয়াখানা ?'

'ইচ্ছে ছিল যাওয়ার—কিন্তু হয়নি। বাবার আপত্তি ছিল। ওই ধরনের জানোয়ার-টানোয়ার উনি একদম পছন্দ করতেন না। একটা আরশোলা দেখলেই বাবার প্রায় হার্ট প্যালপিটেশন হয়ে যেত ! তবে এবার ভাবছি একদিন গিয়ে দেখে আসব।'

মহাবীর তুড়ি মেরে বেয়ারাকে ডাকল। ফেলুদা অবিশ্যি চায়ের দামটা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মহাবীর দিতে দিল না। আমি মনে মনে ভাবলাম যে ফিল্মের অ্যাক্টরের অনেক টাকা, কাজেই মহাবীর দিলে কোনও ক্ষতি নেই।

বিলটা দেবার পর মহাবীর তার সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিল। দেখলাম প্যাকেটটা চারমিনারের।

'আপনি কদিন আছেন ?' মহাবীর জিজ্ঞেস করল।

'পরশু দিন-দুয়েকের জন্য হরিদ্বার যাচ্ছি, তারপর ফিরে এসে বাকি এ মাসটা আছি।'

'আপনারা সবাই যাচ্ছেন হরিদ্বার ?'

'ধীরেনবাবুর কাজ আছে তাই উনি যাবেন না। আমরা তিনজন যাচ্ছি, আর বোধ হয় বনবিহারীবাবু। উনি লছমনঝুলায় একটা অজগরের সন্ধানে যাচ্ছেন।'

রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে পড়লাম। মহাবীর বলল, 'আমার কিন্তু গাড়ি আছে—আমি লিফ্ট দিতে পারি।'

ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'না, থাক। মোটর তো কলকাতায় হামেশাই চড়ি। এখানে টাঙ্গাটা বেড়ে লাগছে।'

এবার মহাবীর ফেলুদার কাছে এসে ওর হাতটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে সত্যিই ভাল লাগল। একটা কথা আপনাকে বলছি—যদি জানতে পারি যে বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি, তার জন্য অন্য কেউ দায়ী, তা হলে সেই অপরাধী খুনিকে খুঁজে বার করে তার প্রতিশোধ আমি নেবই। আমার বয়স বেশি না হতে পারে, কিন্তু আমি চার বছর মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ছিলাম। রিভলভারের লাইসেন্স আছে, আমার মতো অব্যর্থ টিপ খুব বেশি লোকের নেই।...গুড বাই।'

মহাবীর রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে উঠে হুশ্ করে বেরিয়ে চলে গেল।

ফেলুদা খালি বলল, 'সাবাস্।'

আমি মনে মনে বললাম, ফেলুদা যে বলেছিল প্যাঁচের মধ্যে প্যাঁচ সেটা খুব ভুল নয়।

টাঙ্গার খোঁজে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। এটাও বুঝতে পারছিলাম যে ব্রেড জিনিসটার খুব বেশি দরকার বোধহয় ফেলুদার নেই।

৭

হরিদ্বার যেতে হয় ডুন এক্সপ্রেসে। লখ্নৌ থেকে সন্ধ্যায় গাড়ি ছাড়ে, আর হরিদ্বার পৌঁছায় সাড়ে চারটায়।

লখ্নৌ আসার আগে যখন হরিদ্বার যাবার কথা হয় তখন আমার খুব মজা লেগেছিল। কারণ পুরী ছাড়া আমি কোনও তীর্থস্থান দেখিনি। কিন্তু লখ্নৌতে এসে আংটির ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় আর সে রহস্যের এখনও কোনও সমাধান না হওয়ায়, আমার এখন আর লখ্নৌ ছেড়ে যেতে খুব বেশি ইচ্ছা করছিল না।

কিন্তু ফেলুদার দেখলাম উৎসাহের কোনও অভাব নেই। ও বলল, হরিদ্বার, হৃষীকেশ আর লছমনঝুলা—এই তিনটে জায়গা পর পর দেখতে দেখবি কেমন ইন্টারেস্টিং লাগে। কারণ তিন জায়গার গঙ্গা দেখবি তিন রকম। যত উত্তরে যাবি তত দেখবি নদীর ফোর্স বেড়ে যাচ্ছে। আর ফাইন্যালি লছমনঝুলায় গিয়ে দেখবি একেবারে উত্তাল পাহাড়ে নদী। তোড়ের শব্দে প্রায় কথাই শোনা যায় না।'

আমি বললাম, 'তোমার এ সব দেখা আছে বুঝি ?'

'সেই যেবার ক্রিকেট খেলতে লখ্নৌ এলাম, সেবারই দেখা সেরে গেছি।'

ধীরুকাকা অবিশ্যি আমাদের সঙ্গে যেতে পারলেন না, তবে উনি নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদের সকলকে স্টেশনে নিয়ে এলেন। কামরাতে মালপত্র রাখতে না রাখতে আরেকজন ভদ্রলোক এসে পড়লেন, তিনি হচ্ছেন ডাঃ শ্রীবাস্তব। আমি ভাবলাম উনিও বুঝি ধীরুকাকার মতো 'সি-অফ্' করতে এসেছেন, কিন্তু তারপর দেখলাম কুলির মাথা থেকে স্যুটকেস নামাচ্ছেন। আমাদের সকলেরই অবাক ভাব দেখে শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'ধীরুবাবুকে বলিয়েছিলাম যেন আপনাদের না বোলেন। উনি জানতেন আমি যাব আপনাদের সঙ্গে। কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বোলেন তো !'

বাবা দেখলাম খুশি হয়েই বললেন, 'খুব ভালই হল। আমি ভাবতে পারিনি আপনি আসতে পারবেন, তা না হলে আমি নিজেই আপনাকে বলতাম।'

শ্রীবাস্তব বেঞ্চির একটা কোণ্ ঝেড়ে সেখানে বসে বললেন, 'সত্যি জানেন কী—কদিন বড্ড ওয়ারিড আছি। আমাকে বাইরে থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন না। পিয়ারিলালের দেওয়া জিনিসটা এইভাবে গেল—ভাবলে বড় খারাপ লাগে। শহর ছেড়ে দুদিনের জন্য আপনাদের সঙ্গে ঘুরে আসতে পারলে খানিকটা শান্তি পাব।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বনবিহারীবাবুও এসে পড়লেন। তাঁর মালপত্তর যেন একজনের পক্ষে একটু বেশিই মনে হল। ভদ্রলোক হাসিমুখে নমস্কার করে বললেন, 'এইবার রগড় দেখবেন। পবিত্রানন্দস্বামী চলেছেন এ-গাড়িতে। তাঁর ভক্তরা তাঁকে বিদায় দিতে আসছেন। ভক্তির বহরটা দেখবেন এবার।'

সত্যিই, কিছুক্ষণ পরে অনেক লোকজন ফুলের মালাটালা নিয়ে একজন মোটামতো গেরুয়াপরা লম্বা চুলওয়ালা সন্ন্যাসী এসে আমাদের পাশের ফার্স্টক্লাস গাড়িটায় উঠলেন। ওঁর সঙ্গে আরও চার-পাঁচজন গেরুয়াপরা লোক উঠল—আর কিছু গেরুয়াপরা, আর অনেক

এমনি পোশাক পরা লোক কামরার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল। বুঝলাম এরাই সব ভক্তের দল।

গাড়ি ছাড়তে আর পাঁচ মিনিট দেরি, তাই আমরা সব উঠে পড়েছি, ধীরুকাকা কেবল জানালার বাইরে থেকে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় একজন গেরুয়াপরা লোক হঠাৎ ধীরুকাকার দিকে হাসিহাসি মুখ করে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল।

'ধীরেন না ? চিনতে পারছ ?'

ধীরুকাকা কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো চেয়ে থেকে, হঠাৎ—'অম্বিকা নাকি ?'—বলে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন। 'বাপ্‌রে বাপ !—তোমার আবার এ-পোশাক কী হে ?'

'কেন, এ তো প্রায় সাত বছর হতে চলল।'

ধীরুকাকা তখন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'অম্বিকা হল আমার স্কুলের সহপাঠী। প্রায় পনেরো বছর পরে দেখা ওর সঙ্গে।'

গার্ড হুইস্‌ল দিয়েছে। ঘ্যাঁ—চ্‌ করে গাড়ি ছাড়ার শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই শুনতে পেলাম অম্বিকাবাবু ধীরুকাকাকে বলছেন, 'আরে, সেদিন বিকেলে তোমার বাড়ি গিয়ে প্রায় আধঘণ্টা বসে রইলাম। তুমি ছিলে না। তোমার বেয়ারা তোমাকে সে কথা বলেনি ?'

ধীরুকাকা কী উত্তর দিলেন সেটা আর শোনা গেল না, কারণ গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে প্রথমে ফেলুদা, আর তারপর বাবার দিকে চাইলাম। ফেলুদার কপালে দারুণ ভ্রূকুটি।

বাবা বললেন, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ওই ভদ্রলোককেই কি আপনারা আংটিচোর বলে সাসপেক্ট করছিলেন ?'

বাবা বললেন, 'সে-প্রশ্ন অবিশ্যি আর ওঠে না। কিন্তু আংটিটা তা হলে গেল কোথায় ? কে নিল ?'

ট্রেনটা ঘটাং ঘটাং করে লখ্‌নৌ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বেরোল। স্টেশনের মাথার গম্বুজগুলো ভারী সুন্দর দেখতে, কিন্তু এখন আর ও সব যেন চোখেই পড়ছিল না। মাথার মধ্যে সব যেন কীরকম গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল। ফেলুদা নিশ্চয়ই মনে মনে খুব অপ্রস্তুত বোধ করছে। ও-তো সেই সন্ন্যাসীর খোঁজ নিতে নিতে একেবারে লখ্‌নৌ স্টেশন অবধি পৌঁছে গিয়েছিল।

কিন্তু তা হলে স্টেশনের সেই অ্যাটাচি-কেসওয়ালা সন্ন্যাসী কে ? আজকে যাকে দেখলাম সে তো আর ছদ্মবেশধারী সন্ন্যাসী নয়—একেবারে সত্যিকার সন্ন্যাসী। সে কি তা হলে আরেকজন লোক ? আর সেও কি ধীরুকাকার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল ? আর সেটার কারণ কি ওই আংটি, না অন্য কিছু ? আর ফেলুদার গায়ে 'খুব হুঁশিয়ার' লেখা কাগজ কে ছুঁড়ে মেরেছিল—আর কেন ?

ফেলুদার মাথাতে কি এখন এই সব প্রশ্নই ঘুরছে—না সে অন্য কিছু ভাবছে ? ওর দিকে চেয়ে দেখি ও সেই গ্রিক অক্ষরে হিজিবিজি লেখা খাতাটা বার করে খুব মন দিয়ে পড়ছে—আর মাঝে মাঝে কলম দিয়ে আরও কী সব জানি লিখছে।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলেন : 'আচ্ছা, ডক্টর শ্রীবাস্তব—পিয়ারিলাল মারা যাবার আগে আপনিই বোধহয় শেষ তাঁকে দেখেছিলেন, তাই না ?'

শ্রীবাস্তব একটা থলি থেকে কমলালেবু বার করে সকলকে একটা একটা করে দিতে দিতে

বললেন, 'আমি ছিলাম, ওনার বিধবা বোন ছিলেন, ওনার বেয়ারা ছিল, আর অন্য একটি চাকরও ছিল।'

বনবিহারীবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুঁ। ...ওঁর অ্যাটাকটা হবার পর আপনাকে খবর দিয়ে আনানো হয় ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি কি হার্টের চিকিৎসাও করেন ?'

'হাড়ের চিকিৎসা করলে হার্টের যে করা যায় না এমন তো নয় বনবিহারীবাবু ! আর ওঁর ডাক্তার গ্রেহ্যাম শহরে ছিলেন না, তাই আমাকে ডেকেছিলেন।'

'কে ডেকেছিল ?'

'ওঁর বেয়ারা।'

'বেয়ারা ?' বনবিহারীবাবু ভ্রূ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ। প্রীতম সিং। অনেক দিনের লোক। খুব বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত, কাজের লোক।'

বনবিহারীবাবু মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে কমলালেবুর একটা কোয়া মুখে পুরে দিয়ে বললেন, 'আপনি বলেছেন পিয়ারিলাল আংটিটা দিয়েছেন প্রথম অ্যাটাকের পর। আর দ্বিতীয় অ্যাটাকের পর আপনাকে ডাকা হয়, আর সেই অ্যাটাকেই তাঁর মৃত্যু হয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আংটিটা দেবার সময় ঘরে কেউ ছিল কি ?'

'তা কী করে থাকবে বনবিহারীবাবু ? এ সব কাজ কি আর বাইরের লোকের সামনে কেউ করে ? বিশেষ করে পিয়ারিলাল কী রকম লোক ছিলেন তা তো আপনি জানেন। ঢাক বাজিয়ে নোব্‌ল কাজ করার লোক তিনি একেবারেই ছিলেন না। ওনার কত সিক্রেট চ্যারিটি আছে তা জানেন ? লাখ লাখ টাকা হাসপাতালে অনাথাশ্রমে দান করেছেন, অথচ কোনও কাগজে তার বিষয়ে কখনও কিছু বেরোয়নি।'

'হুঁ।'

শ্রীবাস্তব বনবিহারীবাবুর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কি আমার কথা অবিশ্বাস করছেন ?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন—এই আংটি দেওয়ার ঘটনার অন্তত একজন সাক্ষী রাখলে আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করতেন। এমন একটা মূল্যবান জিনিস হাত বদল হল—অথচ কেউ জানতে পারল না।'

শ্রীবাস্তব একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে হঠাৎ হো হো করে হেসে বললেন, 'বাঃ বনবিহারীবাবু, বাঃ ! আমি পিয়ারিলালের আংটি চুরি করলাম, আমিই ধীরেনবাবুর কাছে সেটা রাখলাম, আবার আমিই সেটা ধীরেনবাবুর বাড়ি থেকে চুরি করলাম ? ওয়ান্ডারফুল !'

বনবিহারীবাবু তাঁর মুখের ভাব একটুও না বদলিয়ে বললেন, 'আপনি বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। আমি হলেও তাই করতাম। কারণ আপনার বাড়িতে ডাকাত পড়াতে আপনি সত্যিই ভয় পেয়েছিলেন, তাই আংটিটা ধীরুবাবুর কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। তারপর ধীরুবাবু আলমারি থেকে সরিয়ে সেটা আবার নিজের কাছে রেখে ভাবছেন এইবার ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কী বলো, ফেলু মাস্টার ? আমার গোয়েন্দাগিরিটা কি নেহাত উড়িয়ে দেবার মতো ?'

ফেলুদা তার খাতা বন্ধ করে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, 'ডাক্তার শ্রীবাস্তব যে মহাবীরকে প্রায় দুরারোগ্য ব্যারাম থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তার কি কোনও সাক্ষীর অভাব আছে ?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'না তা হয়তো নেই।'

ফেলুদা বলল, 'আমি বিশ্বাস করি, আংটির দাম যত লাখ টাকাই হোক না কেন, একটি ছেলের জীবনের মূল্যের চেয়ে তার মূল্য বেশি নয়। শ্রীবাস্তব যদি আংটি চুরি করে থাকেন, তা হলে তাঁর অপরাধ নিশ্চয় আছে, কিন্তু এখন যারা ওঁর আংটির পিছনে লেগেছে, তাদের অপরাধ আরও অনেক বেশি, কারণ তারা একেবারে খাঁটি চোর এবং খুব ডেঞ্জারাস জাতের চোর।'

'বুঝেছি।' বনবিহারীবাবুর গলার স্বর গম্ভীর। 'তা হলে তুমি বিশ্বাস করো না যে শ্রীবাস্তবের কাছেই এখনও আংটিটা আছে।'

'না। করি না। আমার কাছে তার প্রমাণ আছে।'

কামরার সকলেই চুপ। আমি অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলাম। বনবিহারীবাবু কিছুক্ষণ ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'কী প্রমাণ আছে তা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

'জিজ্ঞেস নিশ্চয়ই করতে পারেন, কিন্তু উত্তর এখন পাবেন না—তার সময় এখনও আসেনি।'

আমি ফেলুদাকে এরকম জোরের সঙ্গে কথা বলতে এর আগে কখনও শুনিনি।

বনবিহারীবাবু আবার ঠাট্টার সুরে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে সে উত্তর পাব তো?'

ফেলুদা বলল, 'আশা তো করছি। একটা স্পাই-এর রহস্য আছে—সেটা সমাধান হলেই পাবেন।'

'স্পাই?' বনবিহারীবাবু অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন। 'কী স্পাই?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ফেলুবাবু বোধহয় পিয়ারিলালের লাস্ট ওয়ার্ডস-এর কথা বলছেন। মারা যাবার আগে দুবার 'স্পাই' কথাটা বলেছিলেন।'

বনবিহারীবাবুর ভ্রুকুটি আরও বেড়ে গেল। বললেন, 'আশ্চর্য! লখ্‌নৌ শহরে স্পাই?'

তারপর কিছুক্ষণ পাইপটা হাতে নিয়ে চুপ করে কামরার মেঝের দিকে চেয়ে বললেন 'হতে পারে...হতে পারে...আমার একবার একটা সন্দেহ হয়েছিল বটে।'

'কী সন্দেহ?'—শ্রীবাস্তব জিজ্ঞেস করলেন।

'নাঃ। কিচ্ছু না।...আই মে বি রং।'

বুঝলাম বনবিহারীবাবু আর ও বিষয় কিছু বলতে চান না। আর এমনিতেই হরদোই স্টেশন এসে পড়াতে কথা বন্ধই হয়ে গেল।

'একটু চা হলে মন্দ হয় না'—বলে ফেলুদা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম, কারণ ট্রেন স্টেশনে থামলে গাড়ির ভিতর বসে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না।

আমরা নামতেই আরেকজন গেরুয়াপরা দাড়িওয়ালা লোক কোত্থেকে জানি এসে আমাদের গাড়িতে উঠে পড়ল। বনবিহারীবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কামরা রিজার্ভড্—জায়গা নেই, জায়গা নেই!'

তাতে গেরুয়াধারী ইংরিজিতে বলল, 'বেরিলি পর্যন্ত যেতে দিন দয়া করে। তারপর আমি অন্য গাড়িতে চলে যাব। রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করব না।'

অগত্যা বনবিহারীবাবু তাকে উঠতে দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'সন্ন্যাসীদের জ্বালায় দেখছি আর পারা গেল না। এই চা-ওয়ালা!'

চা-ওয়ালা দৌড়ে এগিয়ে এল।

'তুই খাবি?'

'কেন খাব না?'

অন্যদের জিজ্ঞেস করাতে ওঁরা বললেন যে খাবেন না।

গরম চায়ের ভাঁড় কোনও রকমে এ-হাত ও-হাত করতে করতে ফেলুদাকে বললাম, 'শ্রীবাস্তব চোর হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।'

ফেলুদা ওই সাংঘাতিক গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কেন?'

'কারণ ওঁকে আমার বেশ ভাল লাগে—আর মনে হয় খুব ভালমানুষ।'

'বোকচন্দর—তুই যে ডিটেকটিভ বই পড়িসনি। পড়লে জানতে পারতিস যে যে-লোকটাকে সবচেয়ে নিরীহ বলে মনে হয়, সে-ই শেষ পর্যন্ত অপরাধী প্রমাণ হয়।'

'এ ঘটনা তো আর ডিটেকটিভ বইয়ের ঘটনা নয়।'

'তাতে কী হল? বাস্তব জীবনের ঘটনা থেকেই তো লেখকরা আইডিয়া পান।'

আমার ভারী রাগ হল। বললাম, 'তা হলে শ্রীবাস্তব যখন প্রথম দিন আমাদের বাড়িতে বসে গল্প করছিলেন, তখন বাইরে থেকে কে ওঁকে ওয়াচ করছিল, আর চারমিনার খাচ্ছিল?'

'সে হয়তো ডাকাতের দলের লোক।'

'তা হলে তুমি বলছ শ্রীবাস্তবও খারাপ লোক, আর ডাকাতরাও খারাপ লোক? তা হলে তো সকলেই খারাপ লোক—কারণ গণেশ গুহ বলছিল বনবিহারীবাবুও লোক ভাল নয়।'

ফেলুদা উত্তরের বদলে চায়ের ভাঁড়ে একটা বড় রকম চুমুক দিতেই কোত্থেকে জানি একটা দলা পাকানো কাগজ ঠাঁই করে এসে ওর কপালে লেগে রিবাউন্ড করে একেবারে ভাঁড়ের মধ্যে পড়ল।

এক ছোবলে কাগজটা ভাঁড় থেকে তুলে নিয়ে ফেলুদা প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের দিকে চাইতেই গার্ডের হুইস্‌ল্ শোনা গেল। এখন আর কারুর সন্ধানে ছোটাছুটি করার কোনও উপায় নেই।

কম্পার্টমেন্টে ওঠার আগে কাগজটা খুলে একবার নিজে দেখে তারপর আমাকে দেখিয়ে ফেলুদা সেটাকে আবার দলা পাকিয়ে প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে একেবারে ট্রেনের চাকার ধারে ফেলে দিল।

কাগজে লেখা ছিল 'খুব হুঁশিয়ার'—আর দেখে বুঝলাম এবারও পানের রস দিয়েই লেখা।

বাদশাহী আংটির রহস্যজনক আর রোমাঞ্চকর ব্যাপারটা আমরা মোটেই লখ্‌নৌ শহরে ছেড়ে আসিনি। সেটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

৮

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কামরার বাতিগুলো এইমাত্র জ্বলেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে বেরিলির দিকে।

কামরায় সবসুদ্ধ সাতজন লোক। আমি আর ফেলুদা একটা বেঞ্চিতে, একটায় বাবা আর শ্রীবাস্তব, আর তৃতীয়টায় বনবিহারীবাবু আর সেই সন্ন্যাসী। বাবাদের উপরের বাঙ্কে বনবিহারীবাবুর একটা কাঠের প্যাকিং কেস আর একটা বড় ট্রাঙ্ক রয়েছে। আমাদের উপরের বাঙ্কে একটা লোক আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। লখ্‌নৌ স্টেশনে গাড়িতে উঠে অবধি তাকে এই ঘুমন্ত আর চাদরমুড়ি অবস্থাতেই দেখেছি। তার পায়ের ডগাদুটো শুধু বেরিয়ে আছে, উপরের দিকে চাইলেই দেখা যায়।

বনবিহারীবাবু বেঞ্চির উপর পা তুলে বাবু হয়ে বসে পাইপ টানছেন, শ্রীবাস্তব 'গীতাঞ্জলি'

পড়ছেন, আর বাবাকে দেখলেই মনে হয় ওঁর ঘুম পেয়েছে। মাঝে মাঝে চোখ রগড়িয়ে টান হয়ে বসছেন। সন্ন্যাসীর যেন আমাদের কোনও ব্যাপারেই কোনও ইন্টারেস্ট নেই। সে একমনে একটা হিন্দি খবরের কাগজের পাতা উলটোচ্ছে। ফেলুদা জানালার বাইরে চেয়ে গাড়ির তালে তালে একটা গান ধরেছে। সেটা আবার হিন্দি গান। তার প্রথম দুলাইন হচ্ছে—

যব ছোড় চলে লখ্নৌ নগরী
তব হাল আদম্ পর ক্যা গুজরী...

বাকিটা ফেলুদা হুঁ হুঁ করে গাইছে। বুঝলাম ওই দুলাইন ছাড়া আর কথা জানা নেই।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ বললেন, 'ওয়াজিদ আলি শা-র গান তুমি জানলে কী করে?'

ফেলুদা বলল, 'আমার এক জ্যাঠামশাই গাইতেন। খুব ভাল ঠুংরি গাইয়ে ছিলেন।'

বনবিহারীবাবু পাইপে টান দিয়ে জানালার বাইরে সন্ধ্যার লাল আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, 'আশ্চর্য নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলি। গান গাইতেন পাখির মতো। গান রচনাও করতেন। ভারতবর্ষের প্রথম অপেরা লিখেছিলেন—একেবারে বিলিতি ঢং-এ। কিন্তু যুদ্ধ করতে জানতেন না এক ফোঁটাও। শেষ বয়সটা কাটে কলকাতার মেটেবুরুজে—এখন যেখানে সব কলকাতার মুসলমান দরজিগুলো থাকে। আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী জানো? তখনকার বিখ্যাত ধনী রাজেন মল্লিকের সঙ্গে একজোটে কলকাতার প্রথম চিড়িয়াখানার পরিকল্পনা করেন ওয়াজিদ আলি শা।'

কথা শেষ করে বনবিহারীবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বাঙ্কে রাখা ট্রাঙ্কটা খুলে তার ভিতর থেকে একটা ছোট গ্রামোফোনের মতো বাক্স বার করে বেঞ্চির উপরে রেখে বললেন, 'এবার আমার প্রিয় কিছু গান শোনাই। এটা হচ্ছে আমার টেপ রেকর্ডার। ব্যাটারিতে চলে।'

এই বলে বাক্সটার ঢাকনা খুলে হারমোনিয়ামের পর্দার মতো দেখতে একটা সাদা জিনিস টিপতেই বুঝতেই পারলাম কী একটা জিনিস জানি চলতে আরম্ভ করল।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এ গান যদি সত্যি করে উপভোগ করতে হয় তা হলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখতে দেখতে শোনো।'

আমি বাইরের দিকে চেয়ে আবছা আলোতে দেখলাম, বিরাট গাছওয়ালা ঘন অন্ধকার জঙ্গল ছুটে চলেছে ট্রেনের উলটো দিকে। সেই জঙ্গল থেকেই যেন শোনা গেল বনবিড়ালের কর্কশ চিৎকার।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ভলুম ইচ্ছে করে বাড়াইনি—যাতে মনে হয় চিৎকারটা দূর থেকেই আসছে।'

তারপর শুনলাম হাইনার হাসি। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ট্রেনে করে জঙ্গলের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছি—আর সারা জঙ্গল থেকে হাইনার হাসির শব্দ ভেসে আসছে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এর পরের শব্দটা আরেকটু কমানো উচিত, কারণ ওটা শোনা যায় খুব আস্তেই। তবে গাড়ির শব্দের জন্য আমি ওটা একটু বাড়িয়েই শোনাচ্ছি।'

'কির্‌র্‌র্ কিট্ কিট্ কিট্...কির্‌র্‌র্ কিট্ কিট্ কিট্...'

আমার বুকের ভিতরটা যেন টিপ টিপ করতে লাগল। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে দেখি তিনিও অবাক হয়ে শুনছেন।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'র‍্যাট্‌ল স্নেক।...আওয়াজটা শুনলে যদিও ভয় করে, কিন্তু আসলে ওরা নিজের অস্তিত্বটা জানিয়ে দেবার জন্যই শব্দটা করে—যাতে অন্য কোনও প্রাণী অজান্তে ওদের মাড়িয়ে না ফেলে।'

বাবা বললেন, 'তা হলে ওরা এমনিতে মানুষকে অ্যাটাক করে না?'

'জঙ্গলে-টঙ্গলে এমনিতে করে না। সে আমাদের দিশি বিষাক্ত সাপেরাই বা কটা অ্যাটাক করে বলুন। তবে কোণঠাসা হয়ে গেলে করে বইকী। যেমন ধরুন, একটা ছোট ঘরের মধ্যে আপনার সঙ্গে যদি সাপটাকে বন্দি করে রাখা যায়—তা হলে কি আর করবে না ? নিশ্চয়ই করবে। আর এদের আরেকটা আশ্চর্য ক্ষমতা কী জানেন তো—ইন্‌ফ্রা রেড রশ্মি এদের চোখে ধরা পড়ে। অর্থাৎ, এরা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায়।'

তারপর রেকর্ডার বন্ধ করে দিয়ে বনবিহারীবাবু বললেন, 'দুঃখের বিষয় আমার বাকি যে-কটি প্রাণী আছে—বিছে আর মাকড়সা—তারা দুটিই মৌন। এবার যদি অজগরটি পাই, তা হলে তার ফোঁসফোঁসানি নিশ্চয়ই রেকর্ড করে রাখব।'

বাবা বললেন, 'ভয় ভয় করছিল কিন্তু শব্দগুলো শুনে।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু আমার কাছে এ-শব্দ সংগীতের চেয়েও মধুর! বাইরে যখন যাই, জানোয়ারগুলোকে তো তখন নিয়ে যেতে পারি না, তাই এই শব্দগুলোকেই নিয়ে যাই সঙ্গে করে।'

বেরিলিতে আমাদের ডিনার দিল, আর সন্ন্যাসী ভদ্রলোক নেমে গেলেন।

ফেলুদা এক প্লেট খাবার পরেও আমার প্লেট থেকে মুরগির ঠ্যাং তুলে নিয়ে বলল, 'ব্রেনের কাজটা যখন বেশি চলে, তখন মুরগি জিনিসটা খুব হেল্প করে।'

'আর আমি বুঝি ব্রেনের কাজ করছি না !'

'তোরটা কাজ নয়, খেলা।'

'তোমার এত কাজ করে কী ফলটা হচ্ছে শুনি।'

ফেলুদা গলাটা নামিয়ে নিয়ে শুধু আমি যাতে শুনতে পাই এমনভাবে বলল, 'পিয়ারিলাল কোন স্পাই-এর কথা বলেছিলেন সেটার একটা আন্দাজ পেয়েছি।'

এইটুকু বলে ফেলুদা একেবারে চুপ মেরে গেল।

গাড়ি বেরিলি ছেড়েছে। বাবা বললেন, 'ভোর চারটায় উঠতে হবে। তোরা সব এবার শুয়ে পড়।'

বেঞ্চির অর্ধেকটা আমি নিয়ে বাকি অর্ধেকটা ফেলুদাকে ছেড়ে দিলাম। বনবিহারীবাবু বললেন উনি ঘুমোবেন না। 'তবে আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোন, আমি হরিদ্বার আসার ঠিক আগেই আপনাদের তুলে দেব।'

বাবা আর শ্রীবাস্তব ওঁদের বেঞ্চিটায় ভাগাভাগি করে শুয়ে পড়লেন। বনবিহারীবাবু দেখলাম বাতিগুলো নিভিয়ে দিলেন। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হতেই বুঝতে পারলাম বাইরে চাঁদের আলো রয়েছে। শুধু তাই না, আমি যেখানে শুয়ে আছি সেখান থেকে চাঁদটা দেখাও যাচ্ছে। বোধহয় পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদ, আর সেটা আমাদের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে চলেছে।

চাঁদ দেখতে দেখতে আমার মন কেন জানি বলল যে, হরিদ্বারে শুধু তীর্থস্থানই দেখা হবে না—আরও কিছু ঘটবে সেখানে। কিংবা এও হতে পারে যে আমার মন চাইছে হরিদ্বারেও কিছু ঘটুক। শুধু গঙ্গা আর গঙ্গার ঘাট আর মন্দির দেখলেই যেন ওখানে যাওয়াটা সার্থক হবে না।

আচ্ছা, ট্রেনের এত দোলানি আর এত শব্দের মধ্যে কী করে ঘুম এসে যায় ? কলকাতায় আমার বাড়ির পাশে যদি এরকম ঘটাং ঘটাং শব্দ হত, আর আমার খাটটাকে ধরে কেউ যদি ক্রমাগত ঝাঁকুনি দিত, তা হলে কি ঘুম আসত ? ফেলুদাকে কথাটা জিজ্ঞেস করাতে ও বলল, 'এরকম শব্দ যদি অনেকক্ষণ ধরে হয়, তা হলে মানুষের কান তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায় ; তখন আর শব্দটা ডিস্টার্ব করে না। আর ঝাঁকুনিটা তো ঘুমকে হেল্পই করে। খোকাদের দোল

দিয়ে ঘুম পাড়ায় দেখিসনি ? বরং শব্দ আর দোলানি যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তা হলেই ঘুম ভেঙে যাবার চান্স থাকে। তুই লক্ষ করে দেখিস, অনেক সময় স্টেশনে গাড়ি থামলেই ঘুম ভেঙে যায়।'

ঘুমে যখন প্রায় চোখ বুজে এসেছে, তখন একবার মনে হল বাঙ্কের উপর যে লোকটি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, সে যেন উঠে বাঙ্ক থেকে নেমে একবার ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করল। তারপর একবার যেন কার একটা হাসি শুনতে পেলাম—সেটা মানুষও হতে পারে, আবার হাইনাও হতে পারে। তারপর দেখলাম আমি ভুলভুলাইয়ার ভেতর পথ হারিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছি, আর যতবারই এক একটা মোড় ঘুরছি, ততবারই দেখছি একটা প্রকাণ্ড মাকড়সা আমার পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর প্রকাণ্ড দুটো জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। একবার একটা মাকড়সা হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে তার একটা প্রকাণ্ড কালো লোমে ঢাকা পা আমার কাঁধের উপর রাখতেই আমার ঘুম আর স্বপ্ন একসঙ্গে ভেঙে গেল, আর দেখলাম ফেলুদা আমার কাঁধে হাত রেখে ঠেলা দিয়ে বলছে—

'এই তোপ্‌সে ওঠ্ ! হরিদ্বার এসে গেছে।'

৯

'পাণ্ডা চাই, বাবু পাণ্ডা ?'

'বাবুর নামটা কী ? নিবাস কোথায় ?'

'এই যে বাবু, এদিকে ! কোন ধর্মশালায় উঠেছেন বাবু ?'

'বাবা দক্ষেশ্বর দর্শন হবে তো বাবু ?'

প্ল্যাটফর্মে নামতে না নামতে পাণ্ডারা যে এভাবে চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরবে সেটা ভাবতেই পারিনি। ফেলুদা অবিশ্যি আগেই বলেছিল যে এরকম হয়। আর এই সব পাণ্ডাদের কাছে নাকি প্রকাণ্ড মোটা মোটা সব খাতা থাকে, তাতে নাকি আমাদের সব দুশো তিনশো বছরের পূর্বপুরুষদের নাম ঠিকানা লেখা থাকে—অবিশ্যি তাঁরা যদি কোনওদিন হরিদ্বার এসে থাকেন তা হলেই। বাবার কাছে শুনেছি আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদা নাকি সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আর তিনি নাকি অনেকদিন হরিদ্বারে ছিলেন। হয়তো এই সব খাতার মধ্যে তাঁর নাম, ঠিকানা আর হাতের লেখা পাওয়া যাবে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'পাণ্ডাটাণ্ডার কোনও দরকার নেই। এতে সুবিধের চেয়ে উৎপাতটাই বেশি। চলুন, আমার জানা শীতল দাসের ধরমশালায় নিয়ে যাই আপনাদের। একসঙ্গে থাকা যাবে, খাওয়াও মন্দ না। একদিনের তো মামলা। তারপর তো মোটরে করে হৃষীকেশ-লছমনঝুলা।'

কুলির মাথায় জিনিস চাপিয়ে প্রায় রাতের মতো অন্ধকারে আমরা পাঁচজন তিনটে টাঙ্গায় উঠে পড়লাম।—একটায় ফেলুদা আর আমি, একটায় বনবিহারীবাবু, আর একটায় বাবা আর শ্রীবাস্তব।

যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'তীর্থস্থান মানেই নোংরা শহর। তবে একবার গঙ্গার ধারটায় গিয়ে বসতে পারলে দেখবি ভালই লাগবে।'

খট্ খট্ ঘড় ঘড় করতে করতে আমাদের টাঙ্গা অলিগলির মধ্যে দিয়ে চলেছে। দোকান-টোকান এখনও একটাও খোলেনি। রাস্তার দুপাশে লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কেরোসিনের বাতি দু-একটা টিম্ টিম্ করে জ্বলছে এখানে সেখানে। কিছু বুড়ো লোক দেখলাম হাতে ঘটি নিয়ে রাস্তা হেঁটে চলেছে। ফেলুদা বলল ওরা গঙ্গাস্নান

যাত্রী। সূর্য যখন উঠবে তখন কোমরজলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে স্তব করবে। বাকি শহর এখনও ঘুমন্ত বললেই চলে।

আমাদের সামনের গাড়িটায় বনবিহারীবাবু ছিলেন। একটা সাদা একতলা থামওয়ালা বাড়ির সামনে সেটা থামল। আমাদের আর বাবাদের গাড়িও তার পিছনে থামল। বুঝলাম এটাই শীতলদাসের ধর্মশালা।

বাড়ির সামনের ফটকের ভিতর দেখতে পেলাম একটা বেশ বড় খোলা জায়গা, আর তার তিন পাশে বারান্দা আর ঘরের সারি।

ধর্মশালার চাকর এসে মালগুলো তুলে নিয়ে গেল। আমরা তার ফটকের পিছন গেট দিয়ে ঢুকছি, এমন সময় আরেকটা টাঙ্গা এসে ফটকের সামনে দাঁড়াল। তারপর দেখি, বেরিলি পর্যন্ত যে সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তিনি সেই টাঙ্গা থেকে নামলেন। লোকটাকে দেখে আমি ফেলুদার কোটের আস্তিন ধরে একটা টান দিয়ে বললাম, 'এই সেই ট্রেনের সন্ন্যাসী, ফেলুদা!'

ফেলুদা একবার আড় চোখে লোকটার দিকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'এই বাবাজির মধ্যেও তুই রহস্যজনক কিছু পেলি নাকি?'

'কিন্তু বার বার—'

'চোপ্! চ' ভেতরে চ'।'

দুটো পাশাপাশি ঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হল। একটাতে চারটে খাটিয়া পাতা রয়েছে, তার মধ্যে একটাতে একজন লোক ঘুমোচ্ছে, আর বাকি তিনটে আমি, বাবা আর ফেলুদার জন্য ঠিক হল। পাশের ঘরে শ্রীবাস্তব আর বনবিহারীবাবুর ব্যবস্থা হল। বনবিহারীবাবুর ঘরেই দেখলাম সেই বাবাজিও আশ্রয় নিলেন।

মুখটুখ ধুয়ে চা বিস্কুট খেতে খেতে সূর্য উঠে গেল, আর ধর্মশালাতেও লোকজন উঠে গিয়ে বেশ একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। এখন বুঝতে পারলাম কতরকম লোক সেখানে এসে রয়েছে। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ বাঙালি হিন্দুস্থানি মাড়োয়াড়ি গুজরাটি মারাঠি মিলে হইচই হট্টগোল ব্যাপার।

বাবা বললেন, 'তোরা কি বেরোবি নাকি?'

ফেলুদা বলল, 'সেরকম তো ভাবছিলাম। একবার ঘাটের দিকটা ঘুরে এলে...'

'তা হলে সেই ফাঁকে আমি বনবিহারীবাবুর সঙ্গে গিয়ে কাল সকালের জন্য দুটো ট্যাক্সির ব্যবস্থা দেখি। আর একটা কাজ করো তো ফেলু—বাজারের দিকটা গিয়ে একবার দেখো তো যদি এভারেডি টর্চ পাওয়া যায়। এ তো আর লখনৌ শহর না—ও জিনিস একটা হাতে রাখা ভাল।'

আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। ফেলুদা বলল এত ছোট শহরে টাঙ্গা না নিয়ে হাঁটাই ভাল।

হাঁটতে হাঁটতে বুঝলুম হরিদ্বার শহরে সত্যিই বেশ ঠাণ্ডা। আর গঙ্গার পাশে বলেই বোধহয় সমস্ত শহরটা একটা আবছা কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে। ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে ও বলল, 'যত না কুয়াশা তার চেয়ে বেশি উনুনের ধোঁয়া।'

ধর্মশালার সামনের রাস্তা দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একজন লোককে জিজ্ঞেস করতেই সে ঘাটের পথ দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ইহাসে আধা মিল যানেসেই ঘাট মিল যায়গা।'

ঘাটে পৌঁছনোর কিছু আগে থেকেই একটা গণ্ডগোল শুনতে পাচ্ছিলাম, শেষে বুঝতে পারলাম যে সেটা আসলে এত লোক একসঙ্গে স্নান করার গণ্ডগোল। তার উপর ঘাটের পথের দুদিকে ভিখিরি আর ফেরিওয়ালার সারি, তারাও কম চেঁচামেচি করছে না।

আমরা ভিড় ঠেলে ঘাটের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। এরকম দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি। জলের মধ্যে যেন একটা মেলা বসেছে। ঘাটের উপরেই একটা মন্দির, তার থেকে আরতির ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। এক জায়গায় গলায় কণ্ঠী পরা, কপালে তিলক কাটা একজন বৈষ্ণব গান গাইছে। তাকে ঘিরে একদল বুড়োবুড়ি বসে আছে। মানুষের আশেপাশে ছাগল কুকুর গোরুবাছুরও কিছু কম নেই।

ফেলুদা ঘাটের ধাপে একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ে বলল, 'প্রাচীন ভারতবর্ষ যদি দেখতে চাস তো এই ঘাটের ধাপে কিছুক্ষণ বসে থাক।'

লখনৌ থেকে এই জায়গার ব্যাপারটা এত অন্যরকম যে, আমার মন থেকে আংটির ঘটনাটা প্রায় মুছেই যাচ্ছিল। ফেলুদারও কি তাই—না কি ও মনে মনে রহস্য সমাধানের কাজ চালিয়েই চলেছে ? ওকে সে কথাটা আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। ওর দিকে ফিরে দেখি, ও বেশ একটা খুশি খুশি ভাব নিয়ে পকেট থেকে দেশলাই আর সিগারেট বার করেছে। বাবাদের সামনে তো খেতে পারে না, তাই এই সুযোগে খেয়ে নেবে।

সিগারেটটা মুখে পুরে দেশলাইয়ের বাক্সটা খুলতেই দেখলাম তার মধ্যে কী যেন একটা জিনিস ঝলমল করে উঠল।

আমি চমকে উঠে বললাম, 'ওটা কী, ফেলুদা ?'

ফেলুদা ততক্ষণে দেশলাই বার করে বাক্স বন্ধ করে দিয়েছে। সে অবাক হবার ভাব করে বলল, 'কোনটা ?'

'ওই যে চক্ চক্ করে উঠল—দেশলাইয়ের বাক্সে ?'

ফেলুদা কায়দা করে দুহাতের আড়ালে গঙ্গার হাওয়ার মধ্যেও সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'দেশলাইতে ফসফরাস থাকে জানিস তো ? সেইটেই রোদে চক্‌চক্ করে উঠেছে আর কী।'

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, কিন্তু দেশলাইয়ের উপর রোদ পড়ে এতটা ঝলমল করে উঠতে পারে, এ জিনিসটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

হরি-কা-চরণ ঘাট থেকে গঙ্গার দৃশ্য দেখে, দক্ষেশ্বরের মন্দির দেখে বাজারের মনিহারি দোকান থেকে যখন আমরা তিন-সেলের একটা টর্চ কিনছি, তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। যতই ঘুরি না কেন, আর যা-ই দেখি না কেন, ফেলুদার দেশলাইয়ের বাক্সর মধ্যে ওই চক্-চকানির কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। বারবার খালি মনে হচ্ছিল যে ওটা আসলে ওই আওরঙ্গজেবের আংটির হিরের চক্‌চকানি। ফেলুদা যদি বলত ওটা একটা সিকি বা আধুলি—তা হলেও হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম, কিন্তু ফস্‌ফরাসের ব্যাপারটা যে একেবারে গুল, সেটা আমার বুঝতে বাকি ছিল না।

আর আংটিটা যদি সত্যিই ফেলুদার কাছে থেকে থাকে, আর সেটার পিছনে যদি সত্যিই ডাকাত লেগে থাকে, আর সে ডাকাত যদি জেনে থাকে যে ফেলুদার কাছেই আংটিটা আছে—তা হলে ? সেটা সে জানে বলেই কি ফেলুদা ও সব হুমকি দেওয়া-দেওয়া কাগজ পাচ্ছে, আর ওর দিকে গুলতি দিয়ে ইঁট মারছে, আর লাঠির ডগায় ক্লোরোফর্মের ন্যাকড়া বেঁধে আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ?

ফেলুদা কিন্তু সারা রাস্তা গুনগুন করে গান গেয়েছে। একবার গান থামিয়ে আমায় বলল, 'খট্ বলে একটা রাগ আছে জানিস ? এটা সেই রাগ। সকালে গাইতে হয়।'

আমি বলতে চেয়েছিলাম যে 'খটটট্ জানি না, রাগ-রাগিণী জানি না—কিন্তু আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে আর খটকা লাগছে তুমি আমায় ধাপ্পা দিলে কেন।' কিন্তু কথাটা আর বলা হল না, কারণ তখন আমরা ধর্মশালায় পৌঁছে গেছি। মনে মনে ঠিক করলাম যে আজকের মধ্যেই

ফেলুদার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতেই হবে।

ধরমশালার বারান্দায় দেখি বাবা, বনবিহারীবাবু, শ্রীবাস্তব আর একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন।

বাবা আমাদের দেখেই বললেন, 'ট্যাক্সির ব্যবস্থা হয়ে গেছে—কাল ভোর ছটায় রওনা। বনবিহারীবাবুর চেনা থাকায় বেশ শস্তায় হয়ে গেল।'

বাঙালি ভদ্রলোক শুনলাম এলাহাবাদে থাকেন—নাম বিলাসবাবু। তিনি নাকি একজন নামকরা হাত-দেখিয়ে। আপাতত বনবিহারীবাবুর হাত দেখছেন। বনবিহারীবাবু বললেন, 'কোনও জানোয়ারের কামড়-টামড় খেয়ে মরব কি না সেটা একবার দেখুন তো।'

ভদ্রলোক হাতে একটা লবঙ্গ নিয়ে বনবিহারীবাবুর হাতের উপর বুলোতে বুলোতে বললেন, 'কই, তা তো দেখছি না। স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই তো মনে হচ্ছে।'

হতে পারেন বিলাসবাবু হাত-দেখিয়ে, আমার কিন্তু তাঁর পা-টা দেখে ভারী অদ্ভুত লাগল। বুড়ো আঙুলটা তার পাশের আঙুলের চেয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি বড়। আর সেটা দেখে মনে হল খুব রিসেন্ট্‌লি যেন আমি সেরকম পা দেখেছি। কিন্তু কোথায় বা কার পা সেটা মনে করতে পারলাম না।

বনবিহারীবাবু একটা হাঁফ-ছাড়ার শব্দ করে বললেন, 'যাক, বাঁচা গেল।'

'কেন মোশাই, আপনি কি শিকার করেন নাকি? বাঘ-ভাল্লুক মারেন?'

বিলাসবাবুর বাংলায় একটা অবাঙালি টান লক্ষ করলাম।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'নাঃ। তবু—এ সব জেনে-টেনে রাখা ভাল। আমার এক খুড়তুতো ভাই—কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ এক পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে হাইড্রোফোবিয়ায় মরল। তাই আর কী...

'আপনি কি আগে কলকাতায় ছিলেন?' বিলাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

বনবিহারীবাবু একটু অবাক হয়েই বললেন, 'ওটাও কি হাতের রেখায় পাওয়া যায় নাকি?'

'তাই তো দেখছি। আর...আপনার কি পুরনো আমলের শিল্পদ্রব্য বা অন্য দামি জিনিস জমানোর শখ আছে?'

'আমার? না না—আমার কেন? সে ছিল পিয়ারিলালের। আমার শখ জন্তু জানোয়ারের।'

'তাই কি? তাই কামড় খাওয়ার কথা বলছিলেন? কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

বনবিহারীবাবুকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হল। বিলাসবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি সম্প্রতি কোনও উদ্বেগের কারণ ঘটেছে?'

'সম্প্রতি মানে?'

'এই ধরুন—গত মাসখানেকের মধ্যে?'

বনবিহারীবাবু বেশ জোরে হেসে উঠে বললেন, 'মশাই—আমার, যাকে বলে, নট এ কেয়ার ইন দ্য ওয়র্লড। কোনও উদ্বেগ নেই। তবে হ্যাঁ—একটা অ্যাংজাইটি আছে এই যে, কাল লছমনঝুলায় গিয়ে একটা বারো ফুট অজগরের দেখা পাব কি না পাব।'

বিলাসবাবুর বোধহয় আরেকটু দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বনবিহারীবাবু হঠাৎ হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে একটা হাই তুলে বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন—কিছু মনে করবেন না—এ সব পামিস্ট্রি-ফামিস্ট্রিতে আমার বিশ্বাস নেই। আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই আমাদের হাতে বটে—কিন্তু সেটা হাতের রেখায় নয়। হাত বলতে আমি বুঝি ক্ষমতা, সামর্থ্য। সেইটের উপরেই সব নির্ভর করে।'

এই বলে বনবিহারীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা ঘরের ভিতর চলে গেলেন।

আমার চোখ আবার চলে গেল বিলাসবাবুর পায়ের দিকে।

অনেক ভেবেও কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেছি ওরকম লম্বা বুড়োআঙুলওয়ালা পা।

১০

সারাদিনের মধ্যে একবারও ফেলুদাকে সেই ঝলমলে জিনিসটার কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না।

রাত্রে বাবা যদিও বললেন, 'তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়, ভোরে উঠতে হবে—' তবুও খাওয়া-দাওয়া করে বিছানা পেতে শুতে শুতে প্রায় দশটা হয়ে গেল।

লেপের তলায় যখন ঢুকছি, তখন আমাদের পাশাপাশি দুটো ঘরের মাঝখানের দরজা দিয়ে একটা বিকট নাক ডাকার আওয়াজ পেলাম।

ফেলুদা বলল, 'বিলাসবাবু।'

আমি বললাম, 'কী করে জানলে?'

'কেন, কাল ট্রেনেও ডাকছিল—শুনিসনি?'

ট্রেনে? বিলাসবাবু ট্রেনেও ছিলেন? তাই তো! একটা রহস্যের হঠাৎ সমাধান হয়ে গেল।

'ওই বুড়ো আঙুল!'

ফেলুদা আস্তে করে আমার পিঠ চাপড়ে বলল, 'গুড।'

ঠিক কথা। আমাদের উপরের বাঙ্কে উনিই সারা রাস্তা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। কেবল পায়ের ডগা দুটো বেরিয়ে ছিল বাঙ্ক থেকে, আর তখনই দেখেছিলাম ওই বুড়ো আঙুল।

কিন্তু এবার যে আসল প্রশ্নটা করতে হবে ফেলুদাকে। বাবার নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারছিলাম উনি এখনও ঘুমোননি। বাবা না ঘুমোলে কথাটা বলা চলে না, তাই আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে।

ধরমশালাটা ক্রমেই আরও নিঝুম হয়ে আসছে, আর তার সঙ্গে সমস্ত শহরটা। শীতকাল, তাই এমনিতেই লোকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। আমাদের ঘরের ভিতর অন্ধকার। বাইরে উঠোনে বোধহয় একটা লাইট জ্বলছে আর তারই আলো আমাদের দরজার চৌকাঠে এসে পড়েছে। একবার আমাদের ঘরের মেঝে থেকে যেন খুট করে একটা শব্দ এল। বোধহয় ইঁদুর-টিঁদুর কিছু হবে।

এবার বাবার খাটিয়া থেকে শুনলাম ওঁর জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ার শব্দ। বুঝলাম উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি ফেলুদার দিকে ফিরলাম। তারপর গলা নামিয়ে একেবারে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, 'ওটা আংটিই ছিল, তাই না?'

ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমারই মতো ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'তুই যখন জেনেই ফেলেছিস, তখন আর তোর কাছে লুকোনোর কোনও মানে হয় না। আংটিটা আমার কাছেই রয়েছে, সেই প্রথম দিন থেকেই। তোরা সব ঘুমিয়ে পড়ার পর, ধীরুকাকার ঘরে আলনায় ঝোলানো ওঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে আংটিটা বার করে নিই। বাক্সটা নিইনি যাতে ডেফিনিটলি বোঝা যায় আংটিটা গেছে।'

'কিন্তু কেন নিলে আংটিটা ?'

'কারণ ওটা সরিয়ে রাখলে আসল ডাকাতকে উস্‌কে দিয়ে তাকে ধরার আরও সুবিধে হবে বলে।'

'তা হলে সেই সন্ন্যাসী কি আংটিটাই নিতে এসেছিলেন ?'

'অম্বিকাবাবু নয় ; আরেকজন সন্ন্যাসী, যে নকল। যার হাতে অ্যাটাচি কেস ছিল। সে-ই এসেছিল চুরি করতে, কিন্তু গেট থেকেই বৈঠকখানায় আরেকজন গেরুয়াধারীকে দেখে চম্পট দেয়। তারপর টাঙ্গা করে স্টেশনে গিয়ে ওয়েটিংরুমে ঢুকে পোশাক বদলে নেয়।'

'সেই নকল সন্ন্যাসী কে ?'

'একটা সন্দেহ আছে মনে, কিন্তু এখনও প্রমাণ পাইনি।'

'এতদিন ধরে তুমি ওই আংটি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছ ?'

'না।'

'তবে ?'

'একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়েছিলাম।'

'কোথায় ?'

'ভুলভুলাইয়ার একটা খুপরির ভিতর।'

'বাপ্‌রে বাপ্‌! কী সাংঘাতিক বুদ্ধি! এতদিনে বুঝতে পারলাম ফেলুদার দ্বিতীয়বার ভুলাভুলাইয়া যাবার এবং গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যাবার কারণটা। কিন্তু তবু মনে একটা খটকা লাগল, তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু তুমি তো ভুলভুলাইয়ার প্ল্যান জানতে না।'

'প্রথম দিনই সেটার একটা ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা বড় সেটা জানিস তো ? প্রথম দিনে হাঁটবার সময় ভুলভুলাইয়ার প্রত্যেকটি গলির মুখে দেওয়ালের গায়ে নখ দিয়ে ঘষে ১, ২, ৩ করে নম্বর দিয়ে রেখেছিলাম। সাত নম্বর গলির খুপরির মধ্যে ছিল আংটিটা। আমি জানতাম ওর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর নেই। এদিকে হরিদ্বার যাব, অথচ আংটিটা লখ্‌নৌয়ে থেকে যাবে, এটা ভাল লাগছিল না, তাই সেদিন গিয়ে বার করে নিয়ে আসি।'

আমার বুকের ভিতরটা আবার টিপ টিপ করতে আরম্ভ করেছে। বললাম—

'কিন্তু সে ডাকাত যদি সন্দেহ করে যে তোমার কাছে আংটিটা আছে ?'

'সন্দেহ করলেই বা। প্রমাণ তো নেই। আমার বিশ্বাস সন্দেহ করেনি, কারণ অত বুদ্ধি ওদের নেই।'

'কিন্তু তা হলে তোমার পিছনে এভাবে লেগেছিল কেন ?'

'তার কারণ, আংটির লোভ ওরা ছাড়তে পারছে না। আর ওরা জানে যে আমি যদ্দিন আছি, তদ্দিন ওদের সব প্ল্যান ভণ্ডুল করে দেবার ক্ষমতা আমার আছে।'

'কিন্তু—' আমার গলা শুকিয়ে প্রায় আওয়াজই বেরোচ্ছিল না ; কোনও রকমে ঢোক গিলে তবে কথাটা শেষ করতে পারলাম,—'তার মানে তো তোমার সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে।'

'বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াই তো ফেলু মিত্তিরের ক্যারেক্‌টার।'

'কিন্তু—'

'আর কিন্তু না। এবার ঘুমো।'

ফেলুদা একটা তুড়ি মেরে হাই তুলে পাশ বদল করল।

ধরমশালা এখন একেবারে চুপ। দূরে রাস্তায় একটা কুকুর ডেকে উঠল। পাশের ঘরে

নাক ডাকার শব্দ একটানা চলেছে। ঘুম কি আসবে ? ফেলুদার টেক্কামার্কা দেশলাইয়ের বাক্সে রোদের আলোতে ঝলমল করা বাদশাহী আংটির কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। এই আংটির ব্যাপারে কী অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে ফেলুদা নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তা ভাবতেও অবাক লাগে। অথচ এটাও ঠিক যে, ও যদি না থাকত, তা হলে হয়তো আংটি চুরিও হয়ে যেত, আর চোর ধরাও পড়ত না।

'কিররর্ কিট্ কিট্ কিট...কিররর কিট কিট কিট...কিরর কিট কিট্ কিট্ কিট্...'

পাশের ঘর থেকে—কিন্তু মনে হয় যেন অনেক দূর থেকে—র‍্যাট্‌ল স্নেকের আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম বনবিহারীবাবু তাঁর প্রিয় সংগীত শুনছেন।

আর এই ঝুমঝুমির আওয়াজ শুনতে শুনতে বোধহয় ঘুমটা এসে গিয়েছিল।

বাবার ট্র্যাভলিং ক্লক-এ পাঁচটার সময় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল, কিন্তু আমার ঘুম ভেঙে গেল সেটা বাজার একটু আগেই। তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য খাবারের কথা বলতে শ্রীবাস্তব বললেন, 'লছমনঝুলায় একেবারে ব্রিজের মুখেই দোকানে চমৎকার পুরি-তরকারি পাবেন। খাবার নেবার দরকার নেই।'

সকলেই বেশ ভাল করে গরম জামা পরে নিয়েছিলাম। কারণ পথে তো ঠাণ্ডা হবেই, আর লছমনঝুলার হাইট বেশি বলে সেখানে এমনিতেই এখানের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা।

পৌনে ছটার সময় দুটো ট্যাক্সি পর পর এসে ধরমশালার গেটের সামনে দাঁড়াল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম বিলাসবাবুও এসেছেন। শুনলাম উনিও লছমনঝুলা যাবেন বলে আমাদের দলে ঢুকে পড়েছেন। কোন গাড়িতে উঠব ভাবছি, এমন সময় বনবিহারীবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'তিনজন তিনজন করে ভাগাভাগি হয়ে যেতে হবে অবশ্যই। জানোয়ার সম্বন্ধে আমার কিছু ইন্টারেস্টিং গল্প আছে, তপেশবাবু যদি চাও তো আমার গাড়িতে আসতে পারো।'

আমি বললাম, 'শুধু আমি কেন, ফেলুদাও নিশ্চয় শুনতে চাইবে।'

ফেলুদা কোনও আপত্তি করল না। তাই শেষ পর্যন্ত আমি, ফেলুদা আর বনবিহারীবাবু একটা গাড়িতে, আর বাবা, শ্রীবাস্তব আর বিলাসবাবু অন্য গাড়িটায় উঠলাম। শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখলাম বিলাসবাবুর বেশ ভাব হয়ে গেছে।

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বনবিহারীবাবু তাঁর কাঠের বাক্সটা রাখলেন। বললেন, 'এইটেতে আমার অজগর আসবে।' পিছনের সিটের মাঝখানে ফেলুদা, আর দুপাশে আমি আর বনবিহারীবাবু বসলাম।

ঠিক সোয়া ছটার সময় আমাদের গাড়ি দুটো একসঙ্গে রওনা দিল।

শহর ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় পৌঁছতে আরও পাঁচ মিনিট লাগল। সামনে পাহাড়। ডান দিকে চেয়ে থাকলে মাঝে মাঝে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। বনবিহারীবাবুও বোধহয় বেশ ফুর্তিতেই আছেন, কারণ গুনগুন করে গান ধরেছেন। বোধহয় অজগরের আশাতেই ওঁর মনের এই ভাব।

ফেলুদাই কেবল দেখলাম একেবারে চুপ মেরে গেছে। কী ভাবছে ও ? আংটিটা কি এখনও ওর পকেটেই আছে ? সেটা জানার কোনও উপায় নেই। কারণ ও বনবিহারীবাবুর সামনে সিগারেট খাবে না।

বাবাদের ট্যাক্সিটা আমাদের সামনেই চলেছে। ট্যাক্সির পিছনের কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিলাসবাবু শ্রীবাস্তবকে কী সব যেন বোঝাচ্ছেন। হয়তো শ্রীবাস্তব এই ফাঁকতালে তাঁর হাতটা দেখিয়ে নিচ্ছেন।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ বললেন, 'শিশির-ভেজা রাস্তা থেকে এখনও ধুলো উঠছে না, কিন্তু রোদের তেজ বাড়লে উঠবে। আমার মনে হয় ওদের একটু এগিয়ে যেতে দেওয়া উচিত। এই ড্রাইভার—একটু আস্তে চালাও তো দিকি।'

দাড়িওয়ালা পাগড়িপরা পাঞ্জাবি ড্রাইভার বনবিহারীবাবুর কথা মতো গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিল, আর তার ফলে বাবাদের ট্যাক্সি বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল। ধুলো হোক আর যাই হোক, আমি মনে মনে চাইছিলাম গাড়ি দুটো যেন কাছাকাছি একসঙ্গে চলে, কিন্তু বনবিহারীবাবুর আদেশের উপর কিছু বলতে সাহস হল না। ভদ্রলোক জানোয়ারের গল্প আরম্ভ করবেন কখন?

একটা গাড়ি যেন পিছন থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বার বার হর্ন দিচ্ছে। বনবিহারীবাবু বললেন, 'এ তো জ্বালাল দেখছি! পাশ দাও হে ড্রাইভার, পাশ দাও—নইলে প্যাঁক্ প্যাঁক করে কান ঝালাপালা করে দেবে।'

ড্রাইভার বাধ্যভাবে গাড়িটাকে রাস্তার একটু বাঁদিকে নিল, আর অমনি একটা পুরনো ধরনের শোভ্রোলে ট্যাক্সি আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে এগিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলাম যে সে-গাড়ির পিছনের সিটে বসা একজন লোক মুখ বার করে আমাদের দিকে দেখে নিল।

এ আমাদের চেনা লোক—সেই বেরিলি পর্যন্ত যাওয়া গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী।

১১

আমরা আগেই ঠিক করেছিলাম যে প্রথমে লছমনঝুলা যাব, তারপর সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থেকে দুপুরের খাওয়া সেরে ফেরার পথে হৃষীকেশটা দেখে আসব। সত্যি বলতে কী, হৃষীকেশটা সম্বন্ধে আমার খুব বেশি উৎসাহ ছিল না। সেও তো তীর্থস্থান—পাণ্ডা ধর্মশালা অলিগলি ঘাট মন্দির, এই সব—কেবল গঙ্গাটা একটু অন্যরকম।

বনবিহারীবাবু এখন ফেলুদার গানটা ধরেছেন—

'যব ছোড় চলে লখ্‌নৌ নগরী
তব হাল আদ্ পর ক্যা গুজরী!'...

গান থামিয়ে হঠাৎ বনবিহারীবাবু বললেন, 'এই গানের সুরে জ্যোতি ঠাকুরের একটা বাংলা গান আছে জানো?'

ফেলুদা বলল, 'জানি—কত কাল রবে বল ভারত হে।'

'ঠিক বলেছ।'

'তারপর আমার দিকে ফিরে বনবিহারীবাবু বললেন, Steal মানে হরণ, Horn মানে শিং, Sing মানে গান, Gun মানে কামান, Come on মানে আইস, I Saw মানে আমি দেখিয়াছিলাম—এটা জানো?'

এটা আমি জানতাম না; শুনে খুব মজা লাগল, আর মনে মনে মুখস্থ করে নিলাম।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এটার জন্যই বোধহয় আমার গান বলতেই বন্দুকের কথা মনে পড়ে, আর বন্দুক বলতেই জিম করবেট। শিকারি করবেটের কথা জান তো?'

ফেলুদা বলল, 'জানি।'

'তিনি কিন্তু এই সব অঞ্চলে মানুষখেকো বাঘ মেরে গেছেন। আমার করবেটকে কেন এত ভাল লাগে জান? কারণ উনিও আমার মতো জানোয়ারদের স্বভাব বুঝতেন, ওদের ভালবাসতেন।'

এই বলে আবার গুনগুন করে গান ধরলেন বনবিহারীবাবু।

গাড়ি ছুটে চলেছে লছমনঝুলার দিকে। বাঁদিকে পাহাড়, সামনে পাহাড়, ডানদিকে মাঝে মাঝে গঙ্গাটা দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ঘন জঙ্গল। আকাশে মেঘ জমছে। সূর্যটা এক একবার মেঘে ঢেকে যাচ্ছে, আর তক্ষুনি বাতাসটা আরও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আমি প্রথম দিকে কেবল লছমনঝুলার কথাই ভাবছিলাম, এখন আবার মাঝে মাঝে আংটির ব্যাপারটা মনটাকে খোঁচা দিতে আরম্ভ করেছে। অনেক কিছু নতুন জিনিস এ দুদিনে জানতে পেরেছি, কিন্তু আরও অনেক কিছুই যে এখনও জানতে বাকি আছে! মহাবীর কেন সন্দেহ করে যে পিয়ারিলাল স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি? পিয়ারিলাল কীসের জন্য চিৎকার করেছিলেন মারা যাবার আগে? পিয়ারিলাল কোন স্পাই-এর কথা বলতে চেয়েছিলেন? সে স্পাই কি আমাদের চেনার মধ্যে কেউ, না চেনার বাইরে?

এই সব ভাবতে ভাবতে আমার চোখটা গাড়ির সামনে আয়নাটার দিকে চলে গেল। আয়নায় ফেলুদাকে দেখা যাচ্ছে। সে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে কী জানি দেখছে।

এবার আমি আড়চোখে ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি সে দেখছে তার সামনেই বসা ড্রাইভারের দিকে।

আমার চোখটাও প্রায় আপনা থেকেই ঘুরে ড্রাইভারের দিকে গেল, আর সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই আমার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠল।

ড্রাইভারের পাগড়ির নীচে আর কোটের কলারের ঠিক উপরে ঘাড়ের মাঝখানে আঁচড়ের দাগ।

এ রকম দাগ আমরা আরেকজনের ঘাড়ে দেখেছি।

সে হল গণেশ গুহ।

আবার ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি সে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে জানালার বাইরে দেখছে। তাকে এমন গম্ভীর এর আগে আমি কখনও দেখিনি।

কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টে বসে গণেশ গুহ বলেছিল সে বনবিহারীবাবুর চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেই দিনই কলকাতায় চলে যাচ্ছে। আর আজ সে পাঞ্জাবি ড্রাইভারের ছদ্মবেশে আমাদের নিয়ে চলেছে লছমনঝুলা! হঠাৎ মনে পড়ল বনবিহারীবাবুই এই ট্যাক্সি ঠিক করে দিয়েছেন। তা হলে কি...?

আমি আর ভাবতে পারলাম না। আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে আরম্ভ করেছে। আমরা কোথায় চলেছি এখন? লছমনঝুলা, না অন্য কোথাও? বনবিহারীবাবুর উদ্দেশ্যটা কী? অথচ তাঁকে দেখে তো তাঁর মনে কোনও রকম উত্তেজনা বা দুরভিসন্ধি আছে বলে মনে হয় না।

হঠাৎ বনবিহারীবাবুর গলার আওয়াজে চমকে উঠলাম।

'আমরা বাঁয়ে একটা রাস্তা ধরব এবার। ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা গেছে। কিছুদূর গেলেই একটা বাড়ি পাব, সেখানেই আমার অজগরটা থাকার কথা। যাবার সময় একবার দেখে যাই, ফেরার পথে একেবারে বাক্সে পুরে নিয়ে গাড়িতে তুলে নেব। কী বলেন ফেলুবাবু?'

আশ্চর্য শান্তভাবে ফেলুদা বলল, 'বেশ তো।'

আমি কিন্তু একটা কথা না বলে পারছিলাম না—

'আপনি যে বলেছিলেন অজগরটা লছমনঝুলায় আছে?'

বনবিহারীবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'এটা যে লছমনঝুলা নয় সেটা তোমাকে

কে বলল তপেশবাবু ? হাওড়া বলতে কি কেবল হাওড়ার পুল আর তার আশপাশটা বোঝায় ? লছমনঝুলা শুরু হয়ে গেছে এখান থেকেই। গঙ্গার ব্রিজ এখান থেকে মাইল দেড়েক।'

শালবনের মধ্যে দিয়ে আগাছায় ঢাকা, প্রায় দেখা যায় না, এমন একটা পথ ধরে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরল। লক্ষ করলাম ড্রাইভারটা এবার বনবিহারীবাবুর নির্দেশের অপেক্ষাও করল না—যেন তার আগে থেকেই জানা ছিল এ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

'কেমন লাগছে ফেলুবাবু ?'

বনবিহারীবাবুর গলায় একটা নতুন সুর। কথাগুলোর পিছনে যেন একটা চাপা উত্তেজনা লুকোনো রয়েছে।

'দারুণ !'

কথাটা বলেই ফেলুদা তার বাঁ হাতটা দিয়ে আমার ডান হাতটা ধরে আস্তে একটা চাপ দিল। বুঝতে পারলাম ও বলতে চাইছে—ভয় পাস না, আমি আছি।

'রুমাল এনেছিস, তোপ্‌সে ?'

ফেলুদার এ প্রশ্নটার জন্য আমি একেবারেই তৈরি ছিলাম না, তাই কীরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

'রু-রুমাল ?'

'রুমাল জানিস না ?'

'হ্যাঁ—কিন্তু...ভুলে গেছি।'

বনবিহারী বললেন, 'ধুলোর জন্য বলছ ? এখানে কিন্তু ধুলোটা কম হবে।'

'না, ধুলো না'—বলে ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে আমার পকেটে গুঁজে দিল। কেন যে সে এটা করল তা বুঝতেই পারলাম না।

বনবিহারীবাবু তাঁর টেপ রেকর্ডারটা নিজের কোলের উপর নিয়ে সেটাকে চালিয়ে দিলেন। শালবনের ভিতর হাইনা হেসে উঠল।

বন এখন আরও গভীর। সূর্যের আলো আর আসছে না এখানে। এমনিতেই মেঘ আরও ঘন হয়েছে। বাবাদের গাড়ি এখন কোথায় ? লছমনঝুলা পৌঁছে গেছে কি ? আমাদের যদি কিছু হয়, ওঁরা টেরও পাবেন না। সেই জন্যেই কি বনবিহারীবাবু ওঁদের গাড়িটা এগিয়ে যেতে দিলেন ?

মনে যত জোর আছে, সাহস আছে, সব একসঙ্গে জড়ো করার চেষ্টা করলাম। কেন জানি বুঝতে পারছিলাম না ফেলুদার উপর যতই ভরসা থাকুক না কেন, আজ যে অবস্থায় পড়তে হবে ওকে তাতে ওর যত বুদ্ধি, যত সাহস আছে, সবটুকু দরকার হবে।

গাড়ি আরও গভীর বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে এখন। বনবিহারীবাবু আর গান গাইছেন না। এখন কেবল ঝিঁঝির ডাক আর মোটরের চাকার তলায় আগাছার খসখসানি।

প্রায় দশ মিনিট চলার পর গাছের গুঁড়ি আর পাতার ফাঁক দিয়ে কিছু দূরে একটা বাড়ি দেখা গেল। এরকম জায়গায় এত গভীর বনের ভেতর কে আবার বাড়ি তৈরি করল ? হঠাৎ মনে পড়ল, আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা আছেন যিনি সুন্দরবনের কোথায় যেন ফরেস্ট অফিসার। তারও এরকম একটা বাড়ি আছে শুনেছি—আশেপাশে বাঘ ঘোরাফেরা করে। এও হয়তো সেই ধরনের একটা বাড়ি।

আরেকটু কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম বাড়িটা কাঠের তৈরি, আর সেটা বহু পুরনো। শুধু তাই না, বাড়িটা আসলে একটা মাচার ওপর তৈরি। একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সেই মাচায় উঠতে হয়। বাইরে থেকে দেখে মনেই হয় না সেখানে কোনও লোক থাকে।

আমাদের ট্যাক্সি বাড়িটার সামনে এসে থামল। বনবিহারীবাবু বললেন, 'পাঁড়ে আছেন বলে তো মনে হয় না। তবে এসেইছি যখন, তখন ভেতরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করা যাক। হয়তো কাছাকাছির মধ্যেই কোথায় গেছেন কাঠটাঠ সংগ্রহ করতে বোধ হয়। একা মানুষ তো, সব নিজেই করেন। আর ওঁর অত জানোয়ারের ভয় নেই। আমারই মতো। এসো ফেলুচন্দ্র তপেশচন্দ্র ভেতরে গিয়ে বসা যাক। মেকি সন্ন্যাসী তো অনেক দেখলে। এবার একজন সত্যিকারের সাধুপুরুষ কী ভাবে থাকেন দেখবে চলো।'

আমরা তিনজন গাড়ি থেকে নামলাম। ফেলুদা না থাকলে আমার মনের অবস্থা যে কী হত জানি না। এখনও যে সাহস পাচ্ছি তার একমাত্র কারণ হল ফেলুদার নির্বিকার ভাব। এক এক সময় তাই মনে হয় বিপদটা হয়তো আসলে আমার কল্পনা। আসলে ড্রাইভার সত্যিকারের শিখ ড্রাইভার, আর বনবিহারীবাবু খুব ভাল লোক, আর এই বাড়িটায় সত্যিকারের

পাঁড়েজি বলে একজন সাধুপুরুষ থাকেন যাঁর কাছে একটা বারো ফুট লম্বা অজগর সাপ আছে, আর সেটা দেখার জন্যই বনবিহারীবাবু এখানে আসছেন।

আগাছা আর শুকনো শালপাতার উপর দিয়ে হেঁটে কাঠের সিড়িটা দিয়ে উঠে আমরা বাড়িটার ভেতরে ঢুকলাম।

যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা সাইজে আমাদের ট্রেনের কামরার চেয়ে খুব বেশি বড় নয়। ঢোকার দরজা ছাড়াও আরেকটা দরজা আছে, সেটা দিয়ে পাশের আরেকটা ঘরে যাওয়া যায়—কিন্তু মনে হল সে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। দুটো দরজার উলটো দিকে দুটো ছোট্ট জানালাও রয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের শালবন দেখা যাচ্ছে। মাচাটার হাইট একটা মানুষের বেশি নয়।

বনবিহারীবাবু কাঁধে ঝোলানো টেপ রেকর্ডার মাটিতে নামিয়ে রেখে বললেন, 'পাঁড়েজির কেমন সরল জীবনযাত্রা, দেখেই বুঝতে পারছ।'

ঘরের মধ্যে একটা ভাঙা টেবিল, একটা হাতল ভাঙা বেঞ্চি, আর একটা টিনের চেয়ার। ফেলুদা বেঞ্চিটার উপর বসল দেখে আমিও তার পাশে গিয়ে বসলাম।

বনবিহারীবাবু তাঁর পাইপে তামাক ভরে তাতে আগুন দিয়ে, দেশলাইটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে, টিনের চেয়ারটা মজবুত কি না হাত দিয়ে চেপে পরীক্ষা করে, মুখ দিয়ে একটা আরামের শব্দ করে সেটার উপর বসলেন। তারপর পাইপটাতে একটা বিরাট টান দিয়ে ঘরটাকে প্রায় ধোঁয়ায় ভরে দিয়ে, চাপা অথচ পরিষ্কার গলায় ভীষণ স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন—

'তারপর, ফেলুবাবু—আমার আংটিটা যে এবার ফেরত চাই!'

১২

'আপনার আংটি?'

বনবিহারীবাবুর কথাটা যে ফেলুদাকে বেশ অবাক করেছে সেটা বুঝতে পারলাম।

বনবিহারীবাবু ঠোঁটের কোণে পাইপ আর একটা অল্প হাসি নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। বাইরে ঝিঁঝির শব্দ কমে এসেছে। ফেলুদা বলল—

'আর সে আংটি যে আমার কাছে রয়েছে তা আপনি কী করে জানলেন?'

বনবিহারীবাবু এবার কথা বললেন।

'অনুমান অনেক দিন থেকেই করছিলাম। বাইরের একটা লোক এসে ধীরুবাবুর শোবার ঘরের আলমারি খুলে তার থেকে আংটি বার করে নিয়ে যাবে, এটা প্রথম থেকেই কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছিল। তবে তোমার ওপর সন্দেহ গেলেও, এতদিন প্রমাণ পাইনি। এখন পেয়েছি।'

'কী প্রমাণ?'

বনবিহারীবাবু উত্তরে কিছু না বলে মেঝে থেকে টেপ রেকর্ডারটা কোলে তুলে নিয়ে ঢাকনা খুলে সুইচ টিপে দিলেন। যা শুনলাম তাতে আমার রক্ত জল হয়ে গেল। চাকা ঘুরছে, আর যন্ত্রটা থেকে আমার আর ফেলুদার গলার স্বর বেরোচ্ছে—

'ওটা আংটিই ছিল—তাই না?'

'তুই যখন জেনেই ফেলেছিস, তখন আর তোর কাছে লুকোনোর কোনও মানে হয় না। আংটিটা আমার কাছেই রয়েছে—সেই প্রথম দিন থেকেই।—'

বনবিহারীবাবু খট করে রেকর্ডারের সুইচ বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন, 'কাল রাত্রে

তোমরা শোবার আগেই মাইক্রোফোনটা তোমাদের খাটিয়ার তলায় রেখে এসেছিলাম। অবিশ্যি তোমরা যে ঠিক এই বিষয়েই কথাবার্তা বলবে সেটা আমার জানা ছিল না, কিন্তু যখন বলেইছ, তখন কি আর এ সুযোগ ছাড়া যায়? এর চেয়ে বেশি প্রমাণ কি দরকার আছে তোমার—অ্যাঁ, ফেলুবাবু?'

'কিন্তু আংটিটা আপনার, সে কথা আপনি বলছেন কী করে?'

বনবিহারীবাবু রেকর্ডারটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, '১৯৪৮ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে আঠারো বছর আগে, কলকাতার নৌলাখা কোম্পানি থেকে দুলাখ টাকা দিয়ে আমি ও আংটিটা কিনি। পিয়ারিলালের সঙ্গে আমার আলাপ হয় তার কিছু পরেই। তাঁর যে এ সব জিনিসের শখ ছিল সেটা তিনি আমাকে বলেননি, কিন্তু আংটিটা আমি তাঁকে দেখিয়েছিলাম। দেখে তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা যা হয়েছিল, তাতেই আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে। তার দুদিন পরেই আংটিটা আমার বাড়ি থেকে লোপ পেয়ে যায়। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু চোর ধরা পড়েনি। তারপর লখ্‌নৌ এসে কবছর থাকার পর এই সেদিন শ্রীবাস্তবের কাছে আংটিটা দেখে জানতে পারি পিয়ারিলাল সেটা তাঁকে দিয়েছেন। পিয়ারিলাল ভাবেননি তিনি প্রথম অ্যাটাকটা থেকে বেঁচে উঠবেন। তাই মানে মানে চোরাই মাল অন্যের হাতে চালান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমি তাঁর আরোগ্যের সুযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভাবলাম, তিনি যদি ব্যাপারটা স্বীকার করেন, তা হলে শ্রীবাস্তবকে বললে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আংটিটা দিয়ে দেবেন। শ্রীবাস্তবকে তার দরুন কিছু টাকাও দিতে রাজি ছিলাম আমি। কিন্তু আশ্চর্য কী জানো? পিয়ারিলাল চুরির ব্যাপারটা বেমালুম অস্বীকার করে গেলেন! বললেন, আমার কাছে ওরকম আংটি উনি কোনওদিন দেখেননি। অথচ সে আংটির রসিদ পর্যন্ত এখনও আমার কাছে।'

এবার ফেলুদা কথা বলল, আর তার গলার স্বরে ভয়ের কোনও চিহ্নমাত্র নেই।

'কিন্তু বনবিহারীবাবু, আমি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই—আশা করি আপনি তার জবাব দেবেন।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আগে বলো সে-আংটি এখনও তোমার কাছেই রয়েছে, না তুমি সেটা অন্য কোথাও রেখে এসেছ। নিজের জিনিস আমি নিজের হাতেই ফেরত নিতে চাই।'

এবার ফেলুদার গলার বিদ্রূপের ইঙ্গিত—

'কিন্তু এত দিন তো অন্য লোক লাগিয়ে আংটি চুরির চেষ্টার ব্যাপারে, এবং আমার পিছনে লাগার ব্যাপারে আপনার উৎসাহের কোনও অভাব দেখিনি। আপনার ওই গণেশ গুহ লোকটি—যিনি আজ দাড়ি-পাগড়ি পরে পাঞ্জাবি ড্রাইভার সেজেছেন, তিনিই তো বোধ হয় সেই নকল সন্ন্যাসী, তাই না? শ্রীবাস্তবের বাড়ির ডাকাতও তো বোধ হয় তিনিই, আর প্রথম দিন শ্রীবাস্তবকে ধাওয়া করার ভারও তো তার উপরেই ছিল। অবিশ্যি পরে শ্রীবাস্তবকে ছেড়ে আমার পিছনে লাগানো হয় তাকে। রেসিডেন্সিতে গুলতি মারা, ক্লোরোফর্ম দিয়ে আমাকে অজ্ঞান করার চেষ্টা, হুমকি-কাগজ ছুঁড়ে মারা—এ সবই তো তার কাজ, তাই না?'

বনবিহারীবাবু একটু হেসে বললেন, 'সব কাজ তো আর নিজে করা যায় না ফেলুরাম! এমন কিছু কিছু কাজ সব সময়েই থাকে যার ভার অন্যের উপর দিতে হয়। আর বুঝতেই তো পারো—গণেশের স্বাস্থ্যটা তো ভাল, কারণ সে এককালে সার্কাসে বাঘ সিংহ হ্যান্ডল করেছে—সুতরাং ডানপিটেমোর কাজগুলো সে ভালই করে। আর এটা আমি অবশ্যই বলব যে, আমার হুকুমে এ সব কাজগুলো করে সে যে-অপরাধ করেছে, তোমার অপরাধ তার

চেয়ে অনেক বেশি। কারণ তুমি যে-আংটি তোমার কাছে ধরে রেখেছ, তাতে তোমার কোনও অধিকার নেই। ওটা আমার জিনিস, আমার প্রপার্টি। এবং সেটা আমার ফেরত চাই—আজই, এখনই!'

শেষ কথাগুলো বনবিহারীবাবু বললেন প্রায় চিৎকার করে। মনে সাহস আনার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হাত-পা কীরকম যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল।

ফেলুদার উত্তরটা এল ইস্পাতের মতো কঠিন স্বরে—

'খুনের দায়ে অভিযুক্ত হলে পর ও-আংটি কি আপনার কোনও কাজে আসবে?'

বনবিহারীবাবু প্রায় কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'তুমি তো কম বেয়াদব নও হে ছোকরা! যাকে তাকে ফস্ করে খুনি বলে দিচ্ছ।'

'যাকে তাকে বলতে যাব কেন। আমার বিশ্বাস খুনিকেই খুনি বলছি। আপনি পিয়ারিলালের স্পাই-এর ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন কি? পরশু আপনার কথা শুনে মনে হয়েছিল আপনার ও সম্বন্ধে কিছু জানা আছে।'

বনবিহারীবাবু একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'ভেরি সিম্পল্। খুলে বলার কিছু নেই। আমি আংটিটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করার জন্য ওঁর পেছনে কিছু লোক লাগিয়েছিলাম। পিয়ারিলাল নিশ্চয়ই তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।'

'আমি যদি বলি পিয়ারিলালের স্পাই-এর সঙ্গে গুপ্তচরের কোনও সম্পর্ক নেই?'

'তার মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?'

'আপনি পিয়ারিলালের দ্বিতীয় অ্যাটাকের দিন সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাই না?'

'তাতে কী হয়েছে? আমি গেলেই তাঁর অ্যাটাক হবে? তাঁর বাড়িতে তো আগেও গিয়েছি আমি।'

'তখন তো খালি হাতে গেছেন।'

'খালি হাতে মানে?'

'কিন্তু এই শেষবার আপনি খালি হাতে যাননি। আপনার সঙ্গে একটা বাক্স ছিল, আর সেই বাক্সের মধ্যে ছিল আপনার চিড়িয়াখানার একটা অধিবাসী—আপনার বিশাল, বিষাক্ত আফ্রিকান মাকড়সা—ব্ল্যাক্ উইডো স্পাইডার, তাই না? পিয়ারিলাল বলতে চেয়েছিলেন 'স্পাইডার', কিন্তু পুরো কথাটা সেই অবস্থায় উচ্চারণ করা সম্ভব হয়নি, তাই স্পাইডার হয়ে গিয়েছিল 'স্পাই'।'

বনবিহারীবাবুর মুখ হঠাৎ জানি কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল তিনি আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, 'কিন্তু...তাঁকে আমি মাকড়সা দেখিয়ে করবটা কী?'

ফেলুদা বলল, 'পিয়ারিলালের আরশুলা দেখে হৃৎকম্প হয় সেটা বোধহয় আপনার জানা ছিল না। আপনি হয়তো মাকড়সাটা দেখিয়ে ভয় পাইয়ে আংটিটা আদায় করে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হয়ে গেল একেবারে হার্ট অ্যাটাক, এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু। এ মৃত্যুর জন্য আপনি ছাড়া আর কে দায়ী বলুন? আর আপনি বলছেন আংটি আপনি কিনেছিলেন এবং পিয়ারিলাল সেটা চুরি করেন। আমি যদি বলি, আংটি পিয়ারিলাল কিনে কলকাতায় আঠারো বছর আগে আপনাকে দেখিয়েছিলেন। আর সেই থেকে আপনার ও আংটির উপর লোভ—আর আপনার বাড়ির ওই তালা-দেওয়া বন্ধ ঘরে এরকম আরও অনেক পুরনো জিনিস আপনার আছে, আর ওই সব মূল্যবান জিনিস চোর ডাকাতের হাত থেকে সামলানোর জন্যেই আপনার ওই চিড়িয়াখানা?'

বনবিহারীবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি আর কী বিশ্বাস করো সেটা শুনতে পারি কি?'

ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'নিশ্চয় পারেন। আমার বিশ্বাস পিয়ারিলালের ওই বাদশাহী আংটি আপনি আর কোনওদিন চোখেও দেখতে পাবেন না, আর আমার বিশ্বাস আপনার ভবিষ্যতে রয়েছে আপনার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি।'

'গণেশ!'

বনবিহারীবাবুর গুরুগম্ভীর চিৎকারে কাঠের ঘরটা গম্‌গম্‌ করে উঠল।

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'মুখে রুমাল চাপা দে!'

কেন এ কথা বলল জানি না—কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে ফেলুদার দেওয়া রুমালটা বার করে মুখের উপর চাপা দিলাম।

গণেশ গুহ ঘরের ভিতর এসে ঢুকল—হাতে সেই কাঠের বাক্স।

বনবিহারীবাবু দেখি টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে দরজার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

ফেলুদা নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করল, আর তার সঙ্গে সেই মাজনের কৌটোটা—যাতে লেখা 'দশংসংস্কারচূর্ণ'।

গণেশ গুহ বাক্সটা মাটিতে রেখে ঢাকনাটা খুলে যেই পিছিয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে ফেলুদা কৌটোটার ঢাকনা খুলে তার ভিতর থেকে এক খাবলা কী জানি গুঁড়ো তুলে নিয়ে গণেশ আর বনবিহারীবাবুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের মুখে রুমাল চাপা দিল।

আমার রুমালের ফাঁক দিয়ে সামান্য যে গন্ধ এল তাতে বুঝলাম সেটা গোলমরিচ।

সেই গোলমরিচের গুঁড়ো দুজনের চোখে নাকে ঢুকে ওদের যে কী অবস্থা হল তা বলে

বোঝাতে পারব না। প্রথমে যন্ত্রণায় তাদের মুখ একেবারে বেঁকে গেল, তারপরে একসঙ্গে দুজনের আরম্ভ হল হাঁচি আর আর্তনাদ। বনবিহারীবাবু টলতে টলতে দরজার বাইরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে একেবারে সোজা মাটিতে গিয়ে পড়লেন। গণেশ গুহরও প্রায় একই অবস্থা। তবু সে যাবার সময় কোনওরকমে দরজাটা টেনে বন্ধ করে আমাদের বন্দি করে দিয়ে গেল।

এবার মেঝেতে খোলা বাক্সটার দিকে চেয়ে দেখি তার ভিতর থেকে একটা সাপের মাথা বেরিয়েছে, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে সেই হাড়কাঁপানো শব্দ—

'কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌...কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌—কির্‌র্‌র কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌...'

আমি বুঝতে পারলাম আমার মাথার ভিতরটা কেমন জানি করছে, বুঝতে পারলাম ফেলুদা আমাকে ধরে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দিল, আর বুঝলাম যে ফেলুদা নিজেও বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়িয়েছে।

খুব বেশি ভয় পেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয় সেটা এখন বুঝতে পারলাম। যার থেকে ভয়, তার দিকেই যেন চোখটা চলে যায়। কিংবা হয়তো সাপ জিনিসটার সত্যি করেই একটা হিপ্‌নোটাইজ করার ক্ষমতা আছে। মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ অবস্থাতেই স্পষ্ট দেখলাম র‍্যাট্‌ল স্নেকটা বাক্স থেকে বেরিয়ে ঝুমঝুমির শব্দ করতে করতে এদিক ওদিক দেখে আমাদের দিকে চোখটা ফেরাল, আমাদের দিকে চেয়ে রইল, তারপর কাঠের মেঝের উপর দিয়ে দিয়ে এঁকেবেঁকে আমাদেরই বেঞ্চির দিকে প্রায় যেন আমাকে লক্ষ্য করেই এগোতে লাগল।

বুঝলাম আমার চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। সাপটা যখন বেঞ্চি থেকে তিন হাত দূরে, তখন হঠাৎ মনে হল যেন একটা বাজ পড়ল, আর সেটা যেন আমাদের ঘরেরই ভেতর। একটা চোখ ঝলসানো আলো, একটা কানফাটা আওয়াজ, আর তার পরেই বারুদের গন্ধ।

আর সাপ?

সাপের মাথা দেখলাম থেঁতলে শরীর থেকে আলগা হয়ে পড়ে আছে। ঝুমঝুমিটা দু-একবার নড়ে থেমে গেল।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমি শালবনের মধ্যেই একটা শতরঞ্চির উপর শুয়ে আছি। কপাল আর মাথাটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে—বুঝলাম জল দেওয়া হয়েছে। শ্রীবাস্তবের মুখটা প্রথম চোখে পড়ল—আর তার পরেই বাবা।

'কেমন আছেন তপেশবাবু—'

গলাটা শুনে চমকে উঠে পাশ ফিরে দেখি—মহাবীর! কিন্তু গায়ে গেরুয়া পোশাক কেন?

মহাবীর বলল, 'ট্রেনে বেরিলি পর্যন্ত একসঙ্গে এলাম, আর চিনতে পারলে না?'

দারুণ মেক-আপ করে তো লোকটা! দাড়িওয়ালা অবস্থায় সত্যিই চিনতে পারিনি। আর তা ছাড়া গলার আওয়াজ আর কথা বলার ঢংও বদলে ফেলেছিল।

মহাবীর বলল, 'আমার রিভলবারের টিপ দেখলে তো? আসলে যেদিন ভুলভুলাইয়ায় দেখা হল, আর উনি বললেন আমাকে চেনেন না—সেদিন থেকেই বনবিহারীবাবুর উপর আমার সন্দেহ হয়েছিল। কারণ কলকাতায় উনি আমাদের বাড়ি অনেকবার এসেছেন, আমার সঙ্গে কথাও বলেছেন। একদিন বাবার সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হয়েছিল—ওই আংটিটা নিয়েই। সেটাও আমার কিছুদিন আগেই মনে পড়েছে।'

বাবা বললেন, 'তোদের দেরি দেখে লছমনঝুলা থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে শেষটায় টায়ারের দাগ দেখে বনের রাস্তাটা ধরে ভিতরে ঢুকেছি। মহাবীরবাবুই অবিশ্যি গাড়ি ঘোরানোর কথা প্রথম বলেন।'

'আর ওরা দুজন কোথায় গেলেন ?'

'গোলমরিচের ঝাঁজে খুব শাস্তি পেয়েছে। ফেলুর ব্রহ্মাস্ত্রের তুলনা নেই। ওরা এখন পুলিশের জিম্মায় আছে।'

'পুলিশ কোত্থেকে এল ?'

'সঙ্গেই তো ছিল ! বিলাসবাবু তো আসলে ইন্‌স্পেক্টর গরগরি !'

কী আশ্চর্য ! ওই হাত-দেখিয়ে ভদ্রলোকই ইন্‌স্পেক্টর গরগরি ! এমন অদ্ভুত ভাবে যে আংটির ঘটনাটা শেষ হবে তা ভাবতেই পারিনি।

কিন্তু ফেলুদা ? ফেলুদা কোথায় ?

ওর কথা মনে পড়তেই আমার চোখে একটা ঝিলিক-মারা আলো এসে পড়ল। যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকিয়ে দেখি ফেলুদা আঙুলে আংটিটা পরে কিছুদূরে একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়া সূর্যের আলোটা আংটির হিরের উপর ফেলে সেটা রিফ্লেক্ট করে আমার চোখে ফেলছে।

আমি মনে বললাম—এই আংটি রহস্য সমাধানের ব্যাপারে কেউ যদি সত্যি করে বাদশা হয়ে থাকে, তবে সে ফেলুদাই।